# এম্পিয়ারিং

মতি নন্দী

বিশ্ববাণী প্রকাশনী ॥ কলকাতা-৯

প্রথম মুদ্রণ : মাঘ, ১৩৬৭
দ্বিতীয় মুদ্রণ : বৈশাখ, ১৩৮৯
তৃতীয় মুদ্রণ : বইমেলা ১৯৯৪
চতুর্থ মুদ্রণ : আগস্ট, ২০০০

প্রকাশক :
ব্রজকিশোর মণ্ডল
বিশ্ববাণী প্রকাশনী
৭৯/১বি, মহাত্মা গান্ধী রোড
কলকাতা-৯

মুদ্রক :
আর্কটিক প্রিন্টার্স প্রাঃ লিঃ
১বি, রামকৃষ্ণ দাস লেন
কলকাতা-৯

প্রচ্ছদশিল্পী : খালেদ চৌধুরী

# এম্পিয়ারিং

জাপানী বোমার ভয়ে, কলকাতা অর্ধেক খালি করে একবার মানুষ উর্ধ্বশ্বাসে গ্রামে ছুটে গিয়েছিল। আমরাও গিয়েছিলাম আটঘরায়। তারকেশ্বর থেকে খুদে রেল বি-পি-আরে চড়ে আটঘরা মাইলসাতেক। রেলগাড়ি উঠে গিয়ে এখন অবশ্য বাস চলছে। যেমন, তখনকার তিনটে চালাঘর নিয়ে হাইস্কুলটা এখন বিরাট তিনতলা পাকা বাড়ি। আমাদের এই বাৎসরিক, আটঘরার সঙ্গে পাশের গ্রাম বকদিঘির, ক্রিকেট ম্যাচের পত্তন সেই সময় থেকেই।

তখন বাংলায় জমিদাররা ছিল। আটঘরায় ছিল সিংহরা, বকদিঘিতে মুখুজ্যেরা; কর্নওয়ালিস যেদিন থেকে জমিদার তৈরির কাজে হাত দেয়, সেই দিন থেকেই নাকি সিংহ আর মুখুজ্যেদের মধ্যে ঝগড়া, খুনোখুনিরও পত্তন। কালক্রমে সেই বিবাদের চেহারা বদল হতে হতে অবশেষে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ থেকে সেটা বাৎসরিক ক্রিকেট ম্যাচের রূপ নেয়। ডিসেম্বরে বড়দিনের সপ্তাহে ম্যাচটি খেলা হয়। এ পর্যন্ত ফল আটঘরার ১২টি জিত, বকদিঘির ১৩টি। একটিও ড্র হয়নি। খেলাটা হয় হোম-অ্যাওয়ে প্রথায়। একবছর বকদিঘির ফুটবল মাঠে, পরের বছর আটঘরার রথতলায়।

এত বছর ধরে খেলা হচ্ছে, তাই দুই গ্রামের লোকই ক্রিকেটে বেশ রপ্ত হয়ে গেছে। মেডেন ওভারে হাততালি দেয়, এমন কি

খোঁচা মেরে রান পেলে মুচকে হেসেও ফেলে। বকদিঘির উইকেট-কীপার পঞ্চু কলুর বৌ বা আটঘরার দৈত্য-প্রমাণ ফাস্টবোলার চণ্ডী কম্পাউণ্ডারের মা-ও এই খেলা দেখতে মাঠে আসে। যাদের মাঠে খেলা, তারাই লাঞ্চ দিত বিপক্ষকে। কিন্তু বছরছয়েক আগে বকদিঘির লাঞ্চ খেয়ে আধ ঘণ্টার মধ্যেই আটঘরার পুরো টীমটা ফিল্ড করার বদলে মাঠ ছেড়ে পাশের ঝোপঝাড়ে-ভরা মাঠে জরুরী কাজে ফিল্ড করতে ঘন ঘন ছুটে যাওয়ায় আটঘরা হেরে যায়। তখন থেকেই 'নিজেদের-লাঞ্চ-নিজেদের' রীতিটি চালু হয়।

খেলার সাতদিন আগে থেকেই সিংহ আর মুখুজ্যে বংশের লোকেরা গ্রামে আসতে শুরু করে। একজন লোকসভা সদস্যও সেবার হাজির। ম্যাচের নিয়ম, দু-জন আম্পায়ার থাকবে দু-পক্ষ থেকে। আটঘরা হাইস্কুলের অঙ্কের মাস্টার বুদ্ধদেববাবু গত তিন-বছর আম্পায়ারি করছেন, এবার তিনি নারাজ। গতবছর তাঁর দেওয়া তিনটি রান আউট, দুটি এল. বি. ডবল্যু. আটঘরার পাঁচ উইকেটে হারায় প্রভূত সাহায্য করে। মাসচারেক তিনি হাট, পোস্ট অফিস, হেলথ্ সেন্টার কোথাও যেতে পারেননি। কানা-ঘুষো শোনা যায়, বকদিঘি ইস্কুলের সেক্রেটারি বনমালী মুখুজ্যে নাকি অ্যাসিস্ট্যাণ্ট হেডমাস্টার পদে যোগ দেবার জন্য বুদ্ধদেববাবুর কাছে লোক পাঠিয়েছিলেন। কেউ বলে, পঞ্চু কলু নাকি প্রতিমাসে এক কেজি নির্ভেজাল তেল বুদ্ধুস্যারকে পাঠাচ্ছে।

আমি, পরমেশদা—পরেমেশ সিংহ—আর নন্তু দত্ত প্রচুর অনুনয়-বিনয় করেও বুদ্ধদেববাবুকে রাজি করাতে পারলাম না। তাঁর এক কথা: "আমি ভিলিফায়েড বাই মাই ফ্রেণ্ডস অ্যাণ্ড নেইবারস, ইভন বাই মাই পিউপিলস। অনেস্টলি আম্পায়ারি করে দিস প্রাইস

দিতে হল! য়্যা, বলে কিনা সরষের তেল দিচ্ছে! আমি কিনা ব্রাইবড।"

নন্তু দত্তই প্রস্তাব দিল, "চলো গোপীনাথবাবুর কাছে। পার্লামেণ্টের মেম্বার, তার উপর উনি সিংহ নন, সুতরাং নিরপেক্ষ। ওনার ডিসিশনের উপর কথা বলবে, এত সাহস গোটা হুগলী জেলার কারুর নেই।"

গোপীনাথ ঘোষের কাছে গিয়ে কথাটা পাড়ামাত্রই তিনি রাজি। আমরা মুখ চাওয়া-চাওয়ি করলাম। এত তাড়াতাড়ি রাজি হবেন ভাবিনি।

"তবে ভাই, ক্রিকেট আইনের বিন্দুবিসর্গও জানি না। জীবনে ক্রিকেটও খেলিনি।" একগাল হেসে এম পি গোপীনাথ ঘোষ বললেন।

"তাতে কী হয়েছে।" পরমেশদা একজন এম পি আম্পায়ার মাঠে নামানোর কৃতিত্ব থেকে আটঘরাকে বঞ্চিত করতে রাজি নয়। "এখনো চারদিন তো হাতে রয়েছে। অ আ থেকে বিসর্গ চন্দ্রবিন্দু পর্যন্ত আইন আপনার জানা হয়ে যাবে। আমার কাছে উইজডেন আছে। জলের মতো সোজা, সংবিধানের ধারা-উপধারার থেকেও সরল ব্যাপার।"

নন্তু দত্ত বলল, "শুধু মুখস্থ করে ফেলুন, স্যার। আপনার মতো লোক, যাঁর সঙ্গে বাঘা-বাঘা মিনিস্টাররা পর্যন্ত আইন-টাইন নিয়ে ডিবেট করতে ভয় পায় তাঁর কাছে উইজডেন তো—" তুড়ির পটাস শব্দ হল।

আমি বললাম, "আসলে যেটা দরকার, তা হল ব্যক্তিত্ব। ওটা থাকলে কেউ আর ট্যাফোঁ করতে সাহস পাবে না। বকদিঘির পতু

মুখুজ্জ্যে টেঁটিয়া ক্যাপ্টেন, আম্পায়ারকে ঘাবড়ে দিতে দারুণ ওস্তাদ আপনার মতো ব্যক্তিত্ববান, রাশভারি লোক মাঠে থাকলে—”

“বুকের পাটা স্যার, শুধু এইটুকু। আপনি যা বলবেন সবাই মানতে বাধ্য এই কথাটা আর উইজডেন—এই দুটো মনে রাখা তাহলেই আম্পায়ার।”

গোপীনাথ ঘোষ শুনতে শুনতে মাথা নেড়ে গেলেন। আমরা অনেকটা আশ্বস্ত হলাম।

পরদিনই পরমেশদা আর আমি উইজডেন নিয়ে গেলাম। যাবার সময় পরমেশদা আমায় বোঝাল, “রাজনীতি যারা করে-টরে, তাদের নাকের সামনে আইন-কানুন, ধারা-উপধারা এইসব যদি ঘাসের আঁটির মতো ধরিস, দেখবি লোভ সামলাতে পারবে না।”

পরমেশদা কথায় কথায় উইজডেনের পাতা উলটে গোপীনাথ ঘোষের সামনে এগিয়ে ধরে বলল, “এই ৩৫ নম্বর আইনটা, কী যে অদ্ভুত রকমের। ব্যাটসম্যান কট আউট হবে যদি ফিল্ডসম্যান বলটিকে দেহের সঙ্গে আঁকড়ে ধরে। উইকেটকীপারের প্যাডের মধ্যে বল ঢুকে গেলেও কট আউট হবে—আচ্ছা কাণ্ড! আঁকড়ে ধরা আর ঢুকে যাওয়া দুটো কি এক হল?”

“বটে বটে, ইন্টারেস্টিং তো!”

পরমেশদা আবার ঘাসের আঁটি এগিয়ে ধরল।

“কুড়ি নম্বর আইনের চারের উপধারা—”, উইজডেনের পাতা ওলটাল পরমেশদা, “বলছে, আম্পায়ার বাউণ্ডারি নয়।”

“য়্যা, তাই নাকি! যদি হতো তাহলে তো আম্পায়ারকে লক্ষ্য করেই সবাই বল পেটাতো। কি সর্বনাশ! খুব ভেবেচিন্তে আইন করেছে তো। দেখি, দেখি বইটা।”

; আমরা প্রচুর আশ্বস্ত হয়ে বইটা ওঁর হাতে তুলে দিয়ে চলে এলাম। খেলার আগের কটা দিন আমরা দু-বেলা যেতাম। উনি একগাল হেসে শুধু বলতেন, "দারুণ, দারুণ বই। মুখস্থ হয়ে এল প্রায়।"

খেলার দিন গোপীনাথ ঘোষ উইজডেন হাতে এলেন। মাঠের ধারে চেয়ারে বসে মন দিয়ে পড়তে শুরু করলেন। দেখে একটু দমে গেলাম। এখনো মুখস্থ হয়নি, তার উপর প্রকাশ্যে এইভাবে পড়তে দেখলে বকদিঘির লোকেরাই বা কী ভাববে!

"সব রকম ভেবেচিন্তেই দেখছি আইন করেছে। বল আম্পায়ারের গায়ে লাগলে ডেড হবে না, তার পকেটে কি কাপড়চোপড়ের কোথাও আটকে গেলে তবেই হবে। উফ্, কী দূরদৃষ্টি! এবার পার্লামেণ্টের লাইব্রেরিতে উইজডেন রাখার জন্য মোশান আনব।"

গোপীনাথ ঘোষকে থামিয়ে নন্তু দত্ত শুধু মনে করিয়ে দিল, "স্যার, ব্যক্তিত্বের কথাটা ভুলে যাবেন না যেন।"

পতু মুখুজ্যের গলা শোনা গেল। "তোদের আম্পায়ার কে হবে রে?"

পরমেশদা উদাসীন ভঙ্গিতে বলল, "পার্লামেণ্টে কোম্পানি ল সাব-কমিটির মেম্বার গোপীনাথ ঘোষ আমাদের আম্পায়ার। তোমাদের?"

পতু মুখুজ্যে কেমন যেন চুপসে গেল। আমতা আমতা করে বলল, "আমাদের তো বরাবরের মতোই হরিশ কর্মকার।"

বকদিঘি ড্রামাটিক সোসাইটির প্রম্পটার হরিশ কর্মকার। টসে জিতে বকদিঘি আমাদের ব্যাট করতে দিল। মেপে পা ফেলে গোপীনাথ ঘোষ উইকেটের দিকে এগোলেন। অবয়ব থেকে রাশ-ভারিত্ব, বিচ্ছুরিত হচ্ছে। তাঁর পিছনে হরিশ কর্মকার যেন বাঘের

পিছনে কেউ। বকদিঘির ফিল্ডাররা এমনই বোম্‌কে গেছে যে, অন্যান্যবারের মতো ক্যাচ লোফালুফি করে মাঠে নামতে পর্যন্ত ভুলে গেল। শুধু তাই নয়, কারণে-অকারণে বকদিঘির বোলার, উইকেট-কীপার, বলতে গেলে প্রায় গোটা টীমই চিৎকার করে যেরকমভাবে অ্যাপীল করে থাকে, এবার তার কিছুই হল না। এমন নিঃসাড়ে খেলা হতে লাগল যে আটঘরার ব্যাটসম্যানরা নার্ভাস হয়ে পড়ল।

বকদিঘির বোলার মুকুন্দ মালখণ্ডি যখন অ্যাপীল করে, আশ-পাশের গাছ থেকে পাখিরা ভয়ে উড়ে যায়। মুকুন্দ শুধু একবারই অ্যাপীল করেছিল এবং অত্যন্ত সম্ভ্রমভরে, নম্র এবং এতই মৃদুকণ্ঠে যে গোপীনাথ ঘোষ তা শুনতেই পাননি। সোজা তাকিয়ে রইলেন গম্ভীরমুখে। মুকুন্দই শুধু নয় হরিশ কর্মকার পর্যন্ত সেই রাশভারি মৌন-নাকচে এতই জড়োসড়ো বোধ করল যে, পরের ওভারে আমার উইকেটের-সামনে-রাখা পায়ে সোজা বল এসে লাগলেও কর্মকার নট আউট বলে দেয়।

আটঘরার ইনিংস ১১২ রানে শেষ হল। বকদিঘির প্রথম উইকেট পড়ল শূন্য রানে। পতু মুখুজ্যে অফ স্টাম্পের বাইরের বল কাস্তে চালাবার মতো কাট করতেই খিচিং অর্থাৎ স্নিক। উইকেটকীপার ক্যাচ ধরেই অ্যাপীল করল এবং গোপীনাথ ঘোষ আঙুল তুললেন। এক্ষেত্রে পতু মুখুজ্যে বলটা প্যাডে বা বুটে বা কাঁধে লেগেছে বলে সচরাচর তর্ক শুরু করে। এবার একটি কথাও না বলে মাথা নিচু করে উইকেট থেকে চলে গেল।

পরের ওভারে আটঘরার দুটো এল. বি. ডবল্যু. অ্যাপীল গোপীনাথ ঘোষ নাকচ করে দিলেন। মনে মনে আমরা খুশিই হলাম।

আমাদের আম্পায়ারের নিরপেক্ষতা প্রমাণ হয়ে গেল। দ্বিতীয় উইকেট পড়ল ৪০ রানে। তিনটে ক্যাচ জমিতে পড়ল, চণ্ডী কম্পাউণ্ডার এগারোটি ওয়াইড দিল এবং তার বলে ১৪টি বাইরান হওয়া সত্ত্বেও বকদিঘির স্কোর দাঁড়াল সাত উইকেটে ৮৬। তারপর ১০১—৮। ব্যাট করছে অতুল মুখুজ্যে, ছ-ফুট লম্বা, সাড়ে ৯৪ কেজি ওজন, আর বিষ্টু মিশির, সাড়ে-পাঁচ-ফুট লম্বা এবং ওই একই ওজন। শর্ট রান নেবার সময় একবার ওদের পদভারে জমি কেঁপে উইকেটের বেল পড়ে গেল।

আটঘরার হার অবধারিত। বকদিঘি থেকে আসা লোকেরা হইহই শুরু করেছে। অতুল মুখুজ্যে স্টেডি ব্যাট। শুধু সিধে বলগুলো আটকে যাচ্ছে আর বাইরের বল ছেড়ে দিচ্ছে। অন্যদিকে, আলুর আড়তদার মিশিরজি ডাইনে ব্যাট চালিয়ে বাঁয়ে এক রান এবং বাঁয়ে ব্যাট চালিয়ে পিছন থেকে এক রান—এইভাবে বকদিঘিকে ১০৯ রানে নিয়ে গেল।

আর চার রান হলেই জিত। বকদিঘির হাতে দুটো উইকেট।

এমন সময় ঘটল সেই কাণ্ডটা।

পরমেশদার লোপ্পাই বল, পীচের মাঝামাঝি পড়ে বিষ্টু মিশিরের কাছে আর যেন পৌঁছয়ই না। বলটা এত স্লো ছিল। মিশিরজি প্রথমে ঠিক করেছিল, বাঁয়ে ঝাড়ু চালাবে। তারপর বলের গতি দেখে কেমন ভ্যাবাচাকা খেয়ে বেল্চা চালাবার মতো ব্যাটটাকে সামনে ছুঁড়ল বা চালাল। বলটা পীচের মাঝ-বরাবর সোজা আকাশে উঠে গেল।

আটঘরার সবচেয়ে বাজে কিন্তু সবচেয়ে উৎসাহী ফিল্ডসম্যান হোমিওপ্যাথ-ডাক্তার ভুবনেশ্বর সিঙ্গি ছিল মিড-অফ আর কভার

পয়েন্টের মাঝামাঝি। দৌড়ে পীচের উপর গিয়ে, দু-হাতের মুঠো জড়ো করে অপেক্ষা করতে লাগল পড়ন্ত বলটি ক্যাচ করার জন্য।

সেই সময় মিশিরজি প্রাণঘাতী একটা চিৎকার করল অতুল মুখুজ্যের উদ্দেশে—"রান্।"

ব্যাটটাকে তলোয়ারের মতো সামনে ধরে মাথা নিচু করে বিষ্টু মিশির আর ব্যাটটাকে গদার মতো কাঁধে রেখে অতুল মুখুজ্যে— দু-দিকের উইকেটের দিকে দু-জনে রওনা হল। দু-জনের মোট ওজন ১৯০ কেজির একটু বেশি বা কম।

ভুবনডাক্তার দেখতে পাচ্ছে, বরং বলা উচিত শুনতে পাচ্ছে— কেননা তখন সে মুখ তুলে বলের দিকে তাকিয়ে—ওরা দু-জন আসছে। ডাক্তার একটু নরম প্রকৃতির। সম্ভবত ওদের রান নেবার পথে বাধা না হবার জন্যই ভদ্রতাবশত সে পীচ থেকে সরে গেল।

কম্পাউণ্ডার চণ্ডী চিৎকার করে উঠল, "আরে ছাগল, ক্যাচটা যে নষ্ট হবে!"

ডাক্তার এক মুহূর্ত ইতস্তত করেই আবার পীচের উপর দুই স্টিম-রোলারের মাঝে এসে দাঁড়াল। বলটা তার হাতে প্রায় পড়ছে বা পড়েছে, তখনই দু-দিক থেকে দু-জন এসে পড়ল তার উপর। তারপর তিনজনেই মাটিতে। কিন্তু তার মধ্যেই ডাক্তার সিঙ্গি দুই গন্ধমাদনের মাঝের ফাটল থেকে কোনক্রমে মাথাটা বার করে জমি থেকে বলটা কুড়িয়ে তুলে ধরে একটা আওয়াজ করল। আওয়াজে অনেকটা এইরকম একটা বাক্যের আভাস পাওয়া গেল— "হাউজ দ্যাট।"

"আউট।" সময় নষ্ট না করে এম. পি. গোপীনাথ ঘোষ বললেন।

"কেন আউট ?" বিষ্টু মিশির ব্যাটটা আবার তলোয়ারের মতে বাগিয়ে ধরেছে।

"অবস্ট্রাক্টিং দ্য ফিল্ড—আউট।" এরপর সবাইকে অবাক কা গোপীনাথ গড়গড়িয়ে মুখস্থ বলে গেলেন ক্রিকেটের ৪০ নম্বর আইনট মিশিরজি ইংরিজি বোঝে না। হতভম্ব হয়ে সে অতুল মুখুজ্যের দিে তাকাল। অতুল মুখুজ্যে ইংরিজির এম. এ.। গম্ভীর হয়ে মিশিরে দিকে তাকিয়ে ঘাড় নাড়ল।

"বেশ। আইনে যদি বলে তাহলে তো আলবত আউট তারপর সন্দেহাকুল স্বরে বলল, "কিন্তু কে আউট ?"

মাঠ চুপ। সবাই তাকিয়ে গোপীনাথ ঘোষের দিকে। মে হল, এই সমস্যার কী উত্তর হবে সেটা তাঁর জানা নেই। ক্রিকে আইনগুলো ঠিকই মুখস্থ করেছেন, কিন্তু এইরকম পরিস্থিতির উদ্ভ হলে আইনে কী বলা আছে সেটা আর মুখস্থ করা নেই। পীচে ঠিক মাঝখানে, দু-দিক থেকে দু-জন এসে একই সঙ্গে ভুব সিঙ্গির ঘাড়ে পড়েছে। দু-জনের মধ্যে কে অবস্ট্রাকশানের দা অপরাধী ?

"আমাদের মধ্যে কে আউট!" অতুল মুখুজ্যে বিস্ময় সহকা বলল।

"দু-জনেই।" গোপীনাথ ঘোষ তাঁর ব্যক্তিত্ব এবং জোড়া আঙু তুলে ধরলেন।

আশ্চর্য, দুই ব্যাটসম্যানই আর কথা না বলে গুটিগুটি মাঠ ছে চলে গেল। আটঘরা জিতল তিন রানে। বকদিঘির ওরা নিজেদে মধ্যে ফিসফিস গুজগুজ করছিল বটে কিন্তু ভরসা করে প্রতিবা জানাতে এগোয়নি। আইন-কানুন কারুরই তো জানা নেই।

দিনসাতেক পরই পতু মুখুজ্জো ঝড়ের মতো সাইকেল চালিয়ে ারমেশদার বাড়িতে হাজির হয়েছিল। হাতে একটা উইজ্‌ডেন।

"এম. পি. আম্পায়ারকে দিয়ে আটঘরা আমাদের হারিয়েছে। ামলা করবো আমি।" চিৎকার করতে করতে পতু মুখুজ্জো উইজডেন ্লল। "এই ছ্যাখ, খুদে খুদে অক্ষরে কী লেখা রয়েছে।"

পরমেশদা আড়চোখে লালকালির দাগ দেওয়া শেষের কথাগুলো াখে: "ইট ইজ দ্য স্ট্রাইকার হু ইজ আউট।"

"একজনই আউট হয়, দু-জন নয়, আর তোদের এম. পি.··· ঠিক যাছে সামনের বার আমরাও এম্পিয়ারিং দেখাব।"

# বৃদ্ধ বট

গাড়িটা যে এইভাবে পথে বসাবে, চন্দন মিত্র তা ভাবতে পারেনি।

ভোরে দীঘা থেকে রওনা হয়ে খড়গপুর পর্যন্ত মসৃণভাবে এসেছে। ব্রততী আর একবছরের বাবলুকে জামসেদপুরের ট্রেনে তুলে দিয়েছে চন্দন। ব্রততী যাবে বড়দিদির কাছে, থাকবে দিনপনেরো। দীঘায় ওরা দুদিন ছিল চন্দনের এক অনুরাগীর বাড়িতে।

পুরনো স্ট্যাণ্ডার্ড হেরাল্ড। চন্দন ছ' হাজার টাকায় কিনেছে চার মাস আগে। গাড়ি-চালানোটা শিখবে শিখবে করেও এখনো শেখা হয়নি। ড্রাইভার রেখেছে। মাসে তিনশো টাকা বেরিয়ে যাচ্ছে, এটা ওর গায়ে লাগে। কেমন একটা ভয় ওর আছে, নিজে গাড়ি চালালে অ্যাকসিডেন্ট করে ফেলবে।

চারবছর আগে জ্যোতিষী কোষ্ঠীবিচার করে, যা যা বলেছিল তার অধিকাংশই মিলে গেছে। যেমন বিদেশ-ভ্রমণ, যশ-খ্যাতি, আর্থিক সাফল্য, বিয়ে, চাকরি—সবই প্রায়। এশিয়ান গেমস খেলতে ব্যাঙ্কক, তেহরান, ইণ্ডিয়া টীমের সঙ্গে হংকং, সিওল, নাইরোবি, সিঙ্গাপুর, কাবুল, কলম্বো, রেঙ্গুন। মারডেকা খেলতে দুবার কুয়ালালামপুরে। যশ ও খ্যাতি ব্যাপারটা কেমন চন্দন সেটা ঠিক বুঝতে পারে না। সে শুধু লক্ষ্য করেছে বাড়ির বাইরে মানুষজন তাকে দেখলেই তাকায়, মেয়েরা ফিসফাস করে। গাড়িওলা লোকেরা

াকে দেখে গাড়ি থামিয়ে লিফট দিতে চায়, অপরিচিতরা বাড়িতে
নিমন্ত্রণ করে, ফুটবল ফাইনালে পুরস্কার বিতরণ ও দুচার কথা বলার
জন্য প্রায়ই ডাক আসে। তার নামে খবরের কাগজে হেডিং হয়।
চন্দনের সৌরভ' বা 'সুরভিত চন্দন' জাতীয় বিশেষণ তার খেলার
দক্ষতার সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হয়। একবার ট্যাক্সিতে যাবার সময়
কানে এসেছিল: "ভগবানের ছেলে যাচ্ছে রে!" তার ক'দিন
আগেই শীল্ড ফাইনালে, যুগের যাত্রী জিতেছিল তার দেওয়া একমাত্র
গোলে। এ-সব ব্যাপার যদি যশ বা খ্যাতি হয় তাহলে চন্দন যশস্বী
এবং খ্যাতিমান।

আর্থিক সাফল্য অবশ্যই চন্দন পেয়েছে। কোনক্রমে স্কুল
ফাইন্যাল পাশ। ক্লাবই ব্যাঙ্কে চাকরি করে দিয়েছে। এখন পাচ্ছে
প্রায় আটশো। জ্যোতিষী বলেছিল গোমেদ আর পোখরাজ ধারণ
করতে, করেছে। চল্লিশ থেকে পঁয়তাল্লিশ হাজার তার দর উঠেছিল।
দ বছরই। এখন সে ফ্ল্যাটের মালিক, বেনামীতে একটি ওষুধের
দোকান করেছে, পঞ্চাশ হাজার টাকা খাটছে সুদে এবং সম্প্রতি এই
গাড়িটি।

জ্যোতিষী বলেছিল, সুন্দরী বৌ পাবে, বতু অর্থাৎ ব্রততী প্রকৃত
সুন্দরীই। চন্দনের ভক্ত এক ফিল্ম ডিরেক্টর ব্রততীর জন্য কিছুদিন
ধর্না‌ও দিয়েছিল। ফিল্মে নামাটা চন্দনের পছন্দ নয়। বতু তাকে
ভালবাসে এবং সে বতুকে। বতু চায় চন্দন স্মার্ট লোকদের মত
নিজেই গাড়ি চালাক। কিন্তু জ্যোতিষী বলেছিল ত্রিশ বছরের পর
ফাঁড়া আছে, একটা মুক্তো ধারণ করলে হয়। তখন বয়স ছিল
আঠাশ। ত্রিশ হোক্ তো, এই ভেবে মুক্তো আর ধারণ করা হয়নি,
আজও হয়নি।

গাড়িটা কিনেই তার মনে পড়েছিল ফাঁড়ার কথাটা। শরীর ছমছম করে উঠেছিল। গোল এরিয়ার মধ্যে হিংস্রতম ডিফেণ্ডারদের মোকাবিলায় যে কখনো ভয় পায়নি সেই চন্দন মিত্র গোপনে ভয় পায় অ্যাকসিডেন্টকে। হাত-পা-বিচ্ছিন্ন ধড়, গুঁড়িয়ে-যাওয়া পাঁজর, তালগোল-পাকিয়ে-চটকানো দেহ—নিজের এইরকম একটা চেহারা যখনই তার চোখে ভেসে ওঠে তখন কিছুক্ষণের জন্য সে বিমর্ষ বোধ করে। গাড়িতে দীঘা রওনা হবার সময় ড্রাইভার ত্রিপিত সিংকে বারবার নির্দেশ দিয়েছিল,—ত্রিশ মাইলের বেশি জোরে যাবে না, অন্য গাড়ির সঙ্গে রেস দেবে না, ওভারটেক করবে না, ট্রাক-বাস-লরি সামনে পড়লেই বাঁয়ে সরে যাবে।

এইসব বলার পর তার মনে হয়েছিল বয়সটা বোধহয় সত্যিই বেড়েছে। খেলার দিন যে ফুরিয়ে আসছে, তাতো এবারই বোঝা গেল। তন্ময়, বাসব, প্রদীপকে ট্রান্সফারের দশদিন আগে তুলে নিয়ে রেখেছিল, কিন্তু তাকে ছেড়ে রাখে। এক ধাক্কায় দশ হাজার টাকা এবার কমে গেছে।

বোম্বাই রোডের উপর, অচল গাড়িটার দিকে তাকিয়ে চন্দন ভাবল, বয়স বাড়ছে। দু-এক বছরের মধ্যেই টীম তাকে খারিজ করে দেবেই। আয় কমে যাবে। গাড়িটা কেনার কি কোন দরকার ছিল? পাঁচ বছর আগেও তো ট্রাম আর বাস ছিল তার সম্বল। তারও আগে আধপেটা দিন আর এখানে ওখানে খেপ খেলা।

ত্রিপিত সিং খড়্গপুরে ফিরে গেছে ডিস্ট্রিবিউটর বক্সটা সঙ্গে নিয়ে। গোলমাল ওটাতেই ঘটেছে। রাস্তার উপর দাঁড়িয়ে চন্দন খড়্গপুর-গামী একটা ট্রাককে হাত তুলে থামতে বলেছিল। অগ্রাহ্য করে সেটা বেরিয়ে যায়। তার পিছনে একটা প্রাইভেট মোটর ছিল। আপনা

থেকেই সেটা থামে। দরজা খুলে দিয়ে পিছনে-বসা লোকটি
লেছিল, আসুন।

চন্দন ঈষৎ গর্ব বোধ করেছিল। কিন্তু ত্রিপিত ছাড়া ব্যাপারটা
দেখার জন্য আর কেউ ছিল না। গত বছরও দুটো পত্রিকা তাকে
নিয়ে কভার স্টোরি করেছে। লীগ এখন মাঝামাঝি, ইতিমধ্যে
তিনবার তার ছবি বেরিয়েছে। কয়েকলক্ষ লোক তার মুখ চেনে।
শুধুমাত্র তাকে দেখেই গাড়ি থামে, এখনো থামে। দর পড়ে যাওয়া
সত্ত্বেও। বাঙালীরা সত্যিই ফুটবল ভালবাসে।

ওই গাড়িতে ত্রিপিত গেছে খড়্গপুর। ফিরতে কতক্ষণ লাগবে
ক জানে। মনে হয়, ঘণ্টা দুই। গাড়ি পাহারা দেবার জন্য চন্দন
য়ে গেল। কিছুক্ষণ গাড়ির মধ্যে বসে থাকার পর বিরক্ত হয়ে নেমে,
রজা লক্ করে, সে পায়চারি শুরু করল।

রাস্তাটা এখানে, পাশাপাশি ছটা লরি যেতে পারে, এমন চওড়া।
ধারেই ক্ষেত, পাটের আর ধানের। প্রচণ্ড গরমের পর বৃষ্টি হয়ে
গছে দু' সপ্তাহ আগে। কাল রাতেও হয়েছে। দূরে জমিতে
াঙ্গল দিচ্ছে এক চাষী। চন্দন অনেকক্ষণ সেদিকে তাকিয়ে থেকে,
ায়ের জন্য তৃষ্ণা বোধ করল।

বোম্বাই রোড থেকে সরু সরু মাটির পথ বেরিয়ে গ্রামের দিকে
গছে। হাঁটতে হাঁটতে সে ওই রকম এক পথের মুখে এসে পড়ল।
য়েকটা চালাঘরের দোকান। তার পাশে পাঁচিল-ঘেরা এক
গরখানা। গোটাতিনেক একতলা কোয়ার্টার্স। একটা গ্রামেরও
াভাস পাওয়া যায় গাছপালার আড়ালে।

কামারের দোকানের পাশে সাইকেল সারাইএর দোকান, তার
রেরটি চায়ের। দোকানের বাইরে বাঁশের বেঞ্চে দুটি লোক

বসেছিল স্যুটকেস আর থলি নিয়ে। বোধহয় এখানে বাস থামে
চন্দন তাদের পাশে বসল। হাত ঘড়িতে সময় দেখল সাড়ে দশটা

দোকানটির শীর্ণ এবং জীর্ণ দশার মত দোকানীটিও। শাড়িটা
রঙ একদা লাল ছিল বোঝা যায়। যেমন বোঝা যায় ওর গায়ের
একদা গৌর ছিল। হয়তো দেহেও লাবণ্য ছিল এবং তারুণ্যও
এখন ছ'চোখে খিটখিটে উত্তাপ এবং পাণ্ডুর মুখ। একটি বছর দ
বয়সের ছেলে কয়লা ভাঙ্গছে।

"চা হবে ?"

চন্দন গলাটা চড়িয়েই বলল।

"হবে।"

বিস্কুট, চানাচুর, কেক ছাড়াও পাউরুটি এবং বাতাসাও আছে
পান, বিড়ি, সিগারেটও একপাশে। সবকিছুই কম দামী, দেখে মনে
হয় এদের অনেকগুলিই দীর্ঘকাল পড়ে রয়েছে।

এই মেয়েটি বা বৌটিই তাহলে মালিক। এইতো দোকানের
হাল, চলে কি করে ? স্বামী হয়তো কোথাও কাজটাজ করে। এ
সব ভাবতে ভাবতে চন্দন চারধারে চোখ বুলিয়ে, মেদিনীপুরের
প্রাকৃতিক সৌন্দর্য থেকে যথেষ্ট রকমের মনজুড়ানো কিছু না পেয়ে
আবার দোকানের দিকে তাকাল। তার মোটরটাকে সে এখান
থেকে দেখতে পাচ্ছে।

দোকানে ছাঁচা বেড়ায় একটা ফ্রেমে-বাঁধানো ছবি আটকানো
চন্দন অলস চোখে সেটার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে আন্দাজ
করার চেষ্টা করল, ছবিটা কিসের। ছবি যতটা বিবর্ণ তার থেকে
অপরিচ্ছন্ন কাঁচটা। ঠাওর করতে না পেরে, কৌতূহলবশেই সে উঠে
ছবির কাছে এল।

স্ত্রীলোকটি চা তৈরি করতে করতে মুখ ফিরিয়ে তাকে দেখল। প্রায় উলঙ্গ ছেলেটি পিট পিট করে তাকিয়ে। বেঞ্চে-বসা লোকদুটি ঠেছে, বোধহয় বাস আসছে।

মলিন কাঁচের পিছনে, চন্দন ক্রমশ বুঝতে পারল, একটা ফুটবল টীম। আঙ্গুল দিয়ে ঘষে ঘষে সে যা আবিষ্কার করল, তাতে চমকে ঠারই কথা—আই এফ এ-র সাতচল্লিশ সালের টীম, যা বর্মা, সিঙ্গাপুর সফর করেছিল।

"এ ছবি এখানে কে টাঙ্গালো?"

চন্দন স্ত্রীলোকটিকে লক্ষ্য করেই বলল।

"ওর বাবা।"

ছেলেটিকে মুখ তুলে দেখিয়ে দিল। ওর মুখের ভঙ্গির মত ণ্ঠস্বরও কর্কশ।

ছবিটা যুগের যাত্রীর টেণ্টেও টাঙ্গানো আছে। যাত্রীর চারজন ই টীমে ছিল। তাদের নামগুলো চন্দন জানে।

"খুব বুঝি ফুটবল ভালবাসো?"

জবাব এল না। স্ত্রীলোকটির বদলে ছেলেটি বলল: "বাবার বি আছে ওটায়।"

"ভাঁড়ে না গেলাসে?"

স্ত্রীলোকটি বিরক্তমুখে তাকিয়ে।

"ভাঁড়ে।"

চন্দন কৌতূহলভরে এবার ছেলেটির দিকে তাকিয়ে বলল, কোথায় তোমার বাবা?"

ও এগিয়ে এসে, মাটিতে-বসা চারজনের মধ্যে একজনের মুখে াঙ্গুল রাখল।

শিবকৃষ্ণণ!

চন্দন ফ্যালফ্যাল করে ছেলেটির দিকে তাকিয়ে থেকে আবা ছবির দিকে মুখ ফেরাল।

যুগের যাত্রীরই শিবকৃষ্ণণ। ডাকসাইটে লেফট-ইন। ওর আমলে সব থেকে পপুলার প্লেয়ার। হায়দ্রাবাদের কোন এক গ্রাম থেকে বাচ্চা বয়সে কলকাতায় এসে কালীঘাট, স্পোর্টিং ইউনিয়ন ঘুরে দু বছর ইষ্টবেঙ্গলে খেলে যুগের যাত্রীতে আসে। যখন ও খেলা ছাড়ে তখন চন্দনের বয়স বছরচারেক। প্রবীণরা যখন পুরনো আমলের কথা বলে, তখন শিবকৃষ্ণণের নাম অবধারিত ভাবেই ওঠে।

থ্রু পাশ দেবার নাকি মাস্টার ছিল। ধীর শান্তভাবে খেলত হেডিং বা শ্যুটিং তেমন ছিল না। খালি পায়েই খেলে গেছে। পায়ে আঠার মত বল লাগিয়ে রাখত, জনাচারেককে অবহেলায় কাটাতে পারত। 'শিবের মত ইনসাইড আজ কলকাতার মাঠে নেই। এখন সামনে প্লেয়ার পড়লে কাটিয়ে বেরোতে কজন পারে? মনে আছে কে ও এস বি-র হেণ্ডারসনকে ছ'বার কি রকম কাটিয়েছিল।'

সবাই একসঙ্গে মাথা নাড়াবে। শিবের বল হোল্ড করে রাখা নাকি দেখার ছিল। 'নষ্ট হল নেশা করে। গাঁজা, ভাং, চরস কিছুই বাদ ছিল না। এখনকার মত পয়সা তো সে আমলে পেত না। তবু বিশ-পঁচিশ যা পেত, উড়িয়ে দিত। আহা, কি বল ছাড়ত!'

সবাই একসঙ্গে মাথা নাড়াবে। শিবের গান অনেকবার চন্দন শুনেছে। প্রথম দিকে বিস্মিত হত, পরের দিকে বিরক্ত। বুড়োদের কাছে যা কিছু ভালো, সবই পুরনো আমলের। তখন নাকি প্লেয়াররা আদা-ছোলা চিবিয়ে ক্লাবের জন্য জান দিয়ে দিত, টাকা পাওয়ার কথা চিন্তাই করতে পারত না। তখনকার প্লেয়াররা নাকি ভদ্রতায়

াখনের মতো ছিল। 'আজ যে যুগের যাত্রী দেখছ, এত টাকা, এত ফি, এসবের শুরু ওই আমল থেকে। ওরাই ক্লাবকে প্রথম সাকসেস এনে দেয়। রোভার্সে, ডুরাণ্ডে—ফাইনালে, সেমি-ফাইনালে ক্লাবকে তোলে, যাত্রীকে পপুলার করে, অল ইণ্ডিয়া নাম হয়।'

সবাই একসঙ্গে মাথা নাড়াবে। এসব কথা চন্দন মানে। বহু জায়গায় বক্তৃতায় সে ছোটদের উপদেশও দিয়েছে—বড়দের শ্রদ্ধা করবে, অতীতকে ভুলবে না। নিজেও সে অতীতের নামী ফুটবলার দেখলেই প্রণাম করে পায়ে হাত দিয়ে। তারপর দেখে চারপাশের লোক সপ্রশংস চোখে তার দিকে তাকিয়ে, তখন নিজেকে খানিকটা লম্বা মনে হয়।

"শিবকৃষ্ণণ তোমার বাবা?"

চন্দনের কণ্ঠে পরিষ্কার অবিশ্বাস। ছেলেটি লাজুক চোখে স্ত্রীলোকটির দিকে তাকায়।

"হ্যাঁ।"

ভাঁড়টা এগিয়ে ধরে বলল। চন্দন সেটা নিতে নিতে বলল: আপনি?"

"বৌ।"

"উনিই তো যুগের যাত্রীর শিবকৃষ্ণণ?"

"কি জানি।"

"কি জানি!"

চন্দনের বিস্মিত প্রতিধ্বনিতে ভ্রূ কুঁচকে স্ত্রীলোকটি তাকাল।

"উনি তো ফুটবল খেলতেন?"

"হবে। আমি ওসব কিছু জানি না।"

"উনি কোথায়?"

"ঘরে।"

"কিছু করছেন কি, মানে ব্যস্ত? দেখা হতে পারে?"

"করবে আবার কি, যা করার সেতো আমিই করি। দিনরা
তো বিছানাতেই পড়ে থাকে।"

"কিছু হয়েছে কি ওনার?"

"মাথায় যন্ত্রণা, হাঁটুতে ব্যথা, বুকে হাঁপানি, সর্দি কাশি—আপ
কি ওর চেনা? হাসপাতালে ভর্তি করিয়ে দিতে পারেন?"

"চেষ্টা করতে পারি।"

শিবকৃষ্ণণের বৌ চন্দনের মুখের দিকে কয়েক সেকেণ্ড তাকি
থেকে ছেলেকে বলল: "আমি এখন দোকান ছেড়ে যেতে পারব ন
তুই সঙ্গে করে নিয়ে যা।"

ছেলেটির সঙ্গে চন্দন কয়েক পা এগোতেই ডাক পড়ল: "চায়ে
পয়সাটা দিয়ে যান।"

দাম চুকিয়ে সে রওনা হল। গাড়িটা খারাপ হওয়া এখন তা
কাছে 'শাপে বর' মনে হচ্ছে। কলকাতায় ফিরে সবাইকে চম
দেবে।

শিবকৃষ্ণণকে সে খুঁজে বার করেছে, কথা বলেছে। সবাই
ধরেই নিয়েছে, ও মারা গেছে।

জ্যান্ত শিবকৃষ্ণণকে দেখে আসার গল্প করলে সবার আগে দৌ
আসবে তো খবরের কাগজের, ম্যাগাজিনগুলোর লোকেরা।

অল্প দূরেই ছোট্ট একটা কুঁড়ে। একখানিই ঘর। দরজা
দাঁড়িয়ে চন্দন ভিতরে তাকাল। দেয়ালে এক হাত গর্ত, এটা
ঘরের জানালা। ওর মনে হল নিচু তক্তপোষে একটা লোক শুয়ে
ঘরে আসবাব কিছুই নেই। গোটাদুই অ্যালুমিনিয়াম থালা অ

কটা মগ মেঝেয় উপুড় করা। একটা মাটির হাঁড়ি, জলের কলসী ার কয়েকটা শিশি। তক্তপোশের নিচে টিনের সুটকেশ, একজোড়া ানো চটি। দেয়ালে দড়িতে ঝুলছে কাপড়চোপড়। কুলুঙ্গিতে য়েকটা কৌটো আর বিঘতখানেকের আয়না।

লোকটি অর্থাৎ শিবকৃষ্ণণ, যে কলকাতা বা ভারতের ফুটবল মাঠে তাশ বছর আগে 'শিব' নামে খ্যাত ছিল—পাশ ফিরে শুয়ে। ানে জীর্ণ লুঙ্গিমাত্র।

ছেলেটি পিঠে ধাক্কা দিতেই চিত হয়ে মুখ ফেরাল।

"আমি কলকাতা থেকে এসেছি। গাড়িটা খারাপ হয়ে বন্ধ হতে খাবার জন্য দোকানে বসি। ছবিটা দেখে ভাবলুম দেখেই যাই নুষটাকে, এত গল্প শুনেছি আপনার সম্পর্কে।"

শিব উঠে বসল। ছবির লোকটির সঙ্গে চেহারার কোন মিল ই। কাঁচাপাকা দাড়ি-গোঁফে গালের গর্ত ঢাকা, হাতদুটো লাঠির চ সরু, বুকের প্রায় সব পাঁজরই গোনা যায়। শুধু মাথাটার াকৃতি থেকে অনুমান করা যায় এই লোকই শিবকৃষ্ণণ। দেহের ঙ্গ বেমানান আকারের বেঢপ মাথাটা, কপাল মাত্রাতিরিক্ত ড়া। অথচ হেডিং নাকি খুবই বাজে ছিল।

"আমার বিষয়ে গল্পই শুনেছেন, নিশ্চয় খেলা দেখেননি। বয়স ত?"

দুর্বল কণ্ঠস্বর। প্রায় চল্লিশ বছর বাংলায় বাস করে নিখুঁত ংলা উচ্চারণ।

"না, দেখিনি, ঐ ছবিটা যখনকার তখনও আমি জন্মাইনি। াপনার কি অসুখ? সিরিয়াস কিছু কি?"

"না না, অসুখটসুখ কিছু নেই। এ রকম শরীর খারাপ ফুটবলার-

দের তো হয়ই। বল নিয়ে আধঘণ্টা মাঠে এধার ওধার করলেই ঠি
হয়ে যায়।"

"আপনি কি এখনো মাঠে নামেন নাকি ?"

চন্দন অবাক হবে কিনা বুঝতে পারছে না। এই শরীর, এ
বয়স—বলে কী!

"মাঠে নামব যে, মাঠ কোথায়, বল কোথায় ?" একটু হে
বলল, "বয়স কোথায়, হেলথ্ কোথায় ? আসলে আমার মনে হ
ফুটবলারের শরীরের অসুখ সারতে পারে শুধু খেলে, বল খেলে
দাঁড়িয়ে কেন, বসুন বসুন।"

তক্তার তলা থেকে ছেলেটা একটা রবারের বল বার করে পা দি
নাড়াচাড়া করছিল। দূর থেকে ওর মায়ের চিৎকার শুনেই বল
ফেলে রেখে ছুটে বেরিয়ে গেল।

"বৌ আমার বাঙালী, এখানকারই মেয়ে। কলকাতায় হোটে
কাজ করত, আমিও করতুম, তখন পরিচয় হয়। আমার জ
অনেক করেছে, এখনো করে।"

"আপনার এই অবস্থা—ফুটবলারদের সাহায্য-টাহায্য, পেনস
এসব এখন তো দেওয়া হচ্ছে, অ্যাপ্লাই করুন না।"

যেভাবে তাকিয়ে আছে চন্দনের মনে হল না তাতে অভিমা
রয়েছে। অথচ বুড়োরাই তো বেশি অভিমানী হয়।

"টাকার তো সব সময়ই দরকার।"

"আমি তাহলে ফুটবল খেললাম কেন, অন্য কিছু করে টা
রোজগার করতে পারতাম তো। খেলে তো টাকা পেতাম না।"

চন্দন অস্বস্তি বোধ করল। সত্যিইতো, এরা তাহলে কিসের জ
খেলত ? হাততালির জন্য! এইটুকু ছাড়া আর কি ?

"আপনি কোনো খেলাটেলা করেন ?"

চন্দন বলতে যাচ্ছিল, আপনার ক্লাবেই এখনো আমি 'স্টার' গণ্য ই। কিন্তু বলতে গিয়ে, গলাটা কে যেন চেপে ধরল। কোনক্রমে লল

"একটু আধটু, ফুটবলই।"

শরীরে রোগ নেই, আর্থিক কষ্ট নেই, ভালই আছি,—চন্দনের ন হল এই বুড়োটা একটু যেন হামবড়া ধরনের

"আপনি খেলাটেলা দেখেন ?"

"বছরপাঁচেক আগে খড়গপুরে একটা ম্যাচ দেখেছি, তাও ষোল ছর বাদে।"

পাঁচবছর আগে চন্দন খড়গপুরে একটা একজিবিসন ম্যাচ খেলে গছে। দেড়শো টাকা নিয়েছিল। সেই ম্যাচটাই কি ?

"কি মনে হল এখনকার প্লেয়ারদের।"

বৃদ্ধ চুপ করে রইল।

"আপনাদের সময়ে আর এখনকার সময়ের খেলায় অনেক বদল য়ে গেছে।"

"কিন্তু স্কিল, সেন্স, সুটিং এসব ?"

এবার চন্দন চুপ করে রইল।

"আমার খালি রসিদের, সোমানার, মেওয়ার, আপ্পার কথা মনে ড়ছিল।"

এবার চন্দন আড়চোখে ঘড়ি দেখল। প্রায় দু ঘণ্টা কেটেছে, রপিতের ফেরার সময় হল। দেখতে না পেয়ে খোঁজাখুজি করবে। াল ম্যাচ আছে পোরটের সঙ্গে। ইজি ব্যাপার, তাহলেও তাড়াতাড়ি

ফিরে রেস্ট নিতে হবে। তিনটে দিন খুবই ধকলে কেটেছে।

"যে সব গোল মিস করছিল..."

হঠাৎ চন্দনের ইচ্ছে হল এই লোকটিকে কষ্ট দিতে। এই নাক-সিঁটকানো ভাবটা সে অনেক দেখেছে। ঈর্ষা ছাড়া আর কিছু নয়।

"জানেন কি এখন ফুটবলাররা কেমন টাকা পায়?"

"না, কাগজ পড়তে পারি না, লেখাপড়া তো করিনি।"

"চল্লিশ, পঞ্চাশ, ষাট হাজারও।"

"আমি একবার একশো টাকা পেয়েছি মোহনবাগানকে গোল দিয়ে। বকাইবাবু দিয়েছিল খুশি হয়ে। কমল ওই রকম বল না দিলে গোলটা পেতাম না। ওকে পঞ্চাশ দিয়েছিলাম।"

"এখনকার অনেক প্লেয়ারেরই গাড়ি আছে, অনেকেই বাড়ি করেছে, দোকান ব্যবসা ফেঁদেছে, হাজার হাজার টাকা জমিয়েছে।"

কথাগুলো যেন ওর কানে ঢুকল না। পঁয়ত্রিশ-চল্লিশ বছর আগের কোন একটা দিনে ফিরে গিয়ে ও বোধহয় সেই গোলটা দেখতে পাচ্ছে। মুখে হাসি ফুটে উঠেছে।

"আমার হেডিং নাকি খারাপ অথচ গোলটা পেয়েছিলাম হেড করে। বাজে কথা রটানো হয়েছিল আমার সম্পর্কে। জীবনে অনেক গোলই আমি হেড করে দিয়েছি।"

তক্তপোষ থেকে নেমে রবারের বলটা কুড়িয়ে নিয়ে চন্দনকে দিল। হাত ধরে ওকে ঘরের বাইরে আনল।

"এটা ছুঁড়ুন। আপনাকে দেখাচ্ছি কি ভাবে গোলটা করেছি, ছুঁড়ুন।"

চন্দন বিব্রত হয়ে, কিছুটা মজাও পেয়ে বলটা আলতো করে ওর মাথার উপর তুলে দিল। হাত মুঠো করে, অল্প কুঁজো হয়ে ও তৈরী।

বলটা ওর কাঁধের উপর পড়ল। ফসকে গেছে। চন্দন কুড়িয়ে
য়ে এবার আরো আলতো, আরো উঁচু করে তুলে দিল।

মুখ তুলে অপেক্ষা করছে শিবকৃষ্ণণ। বলটা যখন মাথার
াছাকাছি তখন বাঁ ধারে হেড করার জন্য মাথা ঝাঁকাল। ওর
তনির উপর পড়ল!

অপ্রতিভ হয়ে শিবকৃষ্ণণ বলটার দিকে তাকিয়ে রইল মুখ নিচু
রে।

"আবার দিন।"

চন্দন আরো তিনবার বল শূন্যে ছুঁড়ল। তিনবারই ও ফসকাল।

"থাক।"

"না না, আমি পারব, আপনি আবার ছুঁড়ুন।"

দূর থেকে পর পর দু'বার মোটরের হর্ন ভেসে এল। ত্রিপিত
শচয়।

"থাক, আপনার শরীর খারাপ।"

"আর একবার, শুধু একবার।"

বৃদ্ধ যেন ভিক্ষা চাইছে। ওর মুখের দিকে তাকিয়ে মায়া হল
দনের।

"এই শেষবার।"

শিবকৃষ্ণণ অপেক্ষা করছে। চোখদুটো ঠিকরে বেরিয়ে আসতে
য়, ঘাড় এবং বাহুর শিরাগুলো ফুলে উঠেছে। উজ্জ্বল ঝকঝকে
াদ। পিছনে শাখাপ্রশাখা-মেলা বিরাট এক বটগাছ। তার
ছনে বিস্তৃত ক্ষেত। কচি ধানের চারা। লাঙ্গল দিচ্ছে চাষী।
নদিকে একটা ডোবা। কলাগাছ। দূর থেকে ভেসে এল
লকট্রিক ট্রেনের হুইশল। এইসবের মধ্যে এককালের ফুটবলার,

প্রায় অসমর্থ, পঁয়ত্রিশ-চল্লিশ বছর আগের যৌবনে ফিরে যাবার জন্য জেদ ধরে দাঁড়িয়ে। জীবনে শেষবারের মত ও একটা হেডিং দেখাতে চায়।

যদি এবারও ফসকায়? দূরে অধৈর্যভাবে হর্ন বাজল।

এবারও যদি ফসকায়, তাহলে বৃদ্ধ চুরমার হয়ে যাবে। বরং থাক। ওর হেড করা দেখে কোন লাভ নেই। চন্দন বলটা মাটিতে ফেলে দিল।

"কি হল?"

"না। আমার সময় নেই, ড্রাইভার তাড়া দিচ্ছে।"

"শুধু একবার, এই শেষ।"

চন্দন হাঁটতে শুরু করেছে। ওর পিছনে পিছনে আসছে শিবকৃষ্ণণ।

"কতটুকু সময় আর লাগবে, একবার···হেড করতে পারি কি না পারি দেখাব। কলকাতায় গিয়ে আপনি বলবেন, শিবের হেডিং দেখেছি ষাট বছরের শিবের···একটুখানি, একমিনিটও লাগবে না···"

চন্দন হাঁটার বেগ বাড়িয়ে দিল। বৃদ্ধ ওর সঙ্গে তাল রেখে চলতে না পেরে দাঁড়িয়ে পড়ল।

বোম্বাই বোডে পা দিয়ে চন্দন একবার পিছনে তাকায়। বিরাট মাঠ, বিরাট বটগাছের পটভূমিতে জীবনের কিনারায় পৌঁছানো ক্ষীণ চেহারার একটা মানুষকে সে দেখতে পেল।

চন্দন তখনি ঠিক করল, জ্যোতিষীর কথামত কালই মুক্তোর আংটি গড়াতে দেবে।

# আবার এম্পিয়ারিং

পার্লামেন্ট মেম্বর গোপীনাথ ঘোষ ( নামের শেষে এম পি অক্ষর-দুটি দেখতে না পেলে অম্বলে আক্রান্ত হন ) তাঁর আম্পায়ারিং দ্বারা আটঘরা-বকদিঘি ক্রিকেট ম্যাচটিকে গত বছর ঐতিহাসিক মর্যাদায় ভূষিত করে গেছেন। একটিবার তর্জনী তুলেই তিনি একসঙ্গে দুজনকে আউট ঘোষণা করেছিলেন। পীচের মাঝখানে দাঁড়িয়ে ভুবনডাক্তার ক্যাচ লোফার জন্য তৈরী সেই সময় দুইদিক থেকে, ব্যাট হাতে অতুল মুখুজ্যে ও বিষ্টু মিশ্রির বুলডোজারের মত তার ঘাড়ে এসে পড়ে। ক্যাচটা আর লুফতে পারেননি ডাক্তারবাবু। গোপীনাথ ঘোষ একই সঙ্গে মুখুজ্যে ও মিশিরকে ক্রিকেটের ৪০ আইন, 'অবস্ট্রাকটিং দ্য ফিল্ড' অনুসারে আউট দিয়ে দেন। ম্যাচটা হেরে যায় বকদিঘি। অল্পস্বল্প ফিসফাস ছাড়া, সেদিন কেউ এম পি-র সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে কথা বলেনি।

তবে বকদিঘির পতু মুখুজ্যে পরদিনই হুগলি ডি এস এ-কে ঘটনাটি জানিয়ে, অবস্ট্রাকটিং দ্য ফিল্ড আইনে দুজন ব্যাটসম্যানকে একই সঙ্গে আউট দেওয়া আইনসম্মত কিনা এই প্রশ্ন তুলে চিঠি দেয়। ডি এস এ চিঠিটা পাঠায় সি এ বি-কে, নির্দেশ প্রার্থনা ক'রে। সি এ বি চিঠিটা রেফার করে ক্রি-কণ্ট্রোল বোর্ডের রুলস সাব-কমিটির কাছে। তারা দুটি জরুরী মিটিং ডেকে সমস্যার ফয়সলা করতে না পেরে অবশেষে লর্ডসে এম সি সি-র দ্বারস্থ হয়। গোপীনাথের

ডিসিশন কি পরিস্থিতিতে কিভাবে দেওয়া হয়েছে, মাঠের ছবি, যাদের আউট দেওয়া হয় তাদের সঠিক পজিশনের ছবি ইত্যাদি পুঙ্খানুপুঙ্খ জানতে চেয়ে চারটি চিঠি আসে লণ্ডন থেকে বোম্বাই, কলকাতা ঘুরে বকদিঘিতে। অবশেষে ইম্পিরিয়াল ( তখন ওই নাম ছিল ) ক্রিকেট কনফারেন্সে প্রসঙ্গটা ওঠে। আট ঘণ্টা তর্কাতর্কির পর অবশেষে ৪০ আইনের সঙ্গে একটি লাইন জুড়ে দেওয়া হয়ঃ ইট ইজ দ্য স্ট্রাইকার হু ইজ আউট।

ব্যাপারটা উইজডেনের সম্পাদকীয়তে উল্লেখ করা হয়েছিল। ইংল্যাণ্ড, অস্ট্রেলিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকার কাগজে কাগজে গোপীনাথ ঘোষের নাম ছাপা হয়। পার্লামেণ্টেও তিনি অভিনন্দিত হন। কলকাতার কাগজগুলিতে, পতু মুখুজ্যের নামও উল্লেখ করা হয়। ব্যাপারটা নিয়ে সে যদি চিঠি না দিত তাহলে ৪০ আইনে ওই লাইনটার সংযোজনই হত না। মোট কথা, আটঘরা-বকদিঘি বাৎসরিক ম্যাচ রাতারাতি এমনই বিখ্যাত হয়ে গেছে যে শোনা যাচ্ছে, কলকাতা থেকে রিপোর্টার-ফটোগ্রাফারও নাকি এবার বকদিঘিতে আসতে পারে। তাহলে পতু মুখুজ্যের টুপিতে ওটা হবে দ্বিতীয় পালক।

দুই প্রাক্তন জমিদার বাড়ি, আটঘরার সিংহ আর বকদিঘির মুখুজ্যেদের মধ্যে সাবেকি রেষারেষিটা এই বাৎসরিক ম্যাচকে কেন্দ্র করে এখনো জীইয়ে রয়েছে। প্রতিবছর বড়দিনের সময় খেলাটি হয়। ডিসেম্বরের শুরু থেকেই দুই গ্রামের মধ্যে কথাবার্তা এবং যাতায়াত কমে আসে। লাইব্রেরী, টিচার্স রুম, ডাক্তারখানা, কো-অপারেটিভ এবং বি ডি ও অফিস, হেলথ সেণ্টার, সিদ্ধেশ্বরীতলা, শেখ বসিরের কোল্ড স্টোরেজ, নরেন মান্নার দি নিউ নেতাজী ভাণ্ডার

অ্যাণ্ড রেষ্টুরেণ্ট—সর্বত্রই থমথমে আবহাওয়ায় ফিসফাস শুরু হ
যায়।

এবারেও শুরু হয়েছে।

পতু মুখুজ্যে নাকি বলেই রেখেছে, এবার দেখিয়ে দেবে। কি
দেখাবে সেটা নিয়েই জল্পনা-কল্পনা।

শোনা যাচ্ছে, মুখুজ্যেদের বড় তরফের সেজ মেয়ের ছাওরপো
শিশিরকে ওরা নাকি জামসেদপুর থেকে আনাবে। শিশির গত বছ
রঞ্জি ট্রফিতে খেলেছে বিহারের পক্ষে। কথা উঠেছে, তার খেলা
যোগ্যতা নিয়ে। সে বা তার বংশের কেউ বকদিঘিতে কখনো তে
রাত্তির বাস করেছে কিনা।

এই ম্যাচে খেলার জন্য যে কটি যোগ্যতা দরকার, তার একটি হল
তে-রাত্তির বাস। পতু মুখুজ্যে বলেছে, শিশির তার এগার বছ
বয়সে দুর্গাপুজার সময় এসে সাতদিন বকদিঘিতে ছিল। মেজ
খুড়িমার কাছে রক্ষিত, তখনকার তোলা একটি গ্রুপ ফোটো প্রমা
দেবে।

শোনা যাচ্ছে, পতু মুখুজ্যে কলকাতা থেকে পাশকরা আম্পায়া
আনাবে। বকদিঘির গোবিন্দ বর্ধনের ছোট নাতি জিতু বর্ধন নাকি
কলকাতায় আম্পায়ারিংয়ে ভীষণ নাম করে ফেলেছে। এই বছ
লীগে প্রথম ম্যাচেই সে দশটি এল. বি. ডবল্যু. দিয়েছে। খবরে
কাগজে চিঠি লেখালেখি চলছে—ওয়ার্লড রেকর্ড কিনা?

আজ পর্যন্ত দুই পক্ষের ফল ১৩:১৩! একটিও ড্র হয়নি
সুতরাং এবারের সাতাশতম ম্যাচটিকে নিয়ে এগারো মাইল দূরে
গোপীনগরে পর্যন্ত বাজি ধরা হবে, সেটা এমন কিছু আশ্চর্যের নয়।

অনেক রকম কথাই কানে আসছে, কিন্তু তাই নিয়ে আমি ব

পরমেশ সিংহ বা নন্তু দত্ত একটুও বিচলিত হচ্ছি না। প্রতিবছরই গুজব ওড়ে কিন্তু শেষ পর্যন্ত দেখা যায়, সেই চণ্ডী কম্পাউণ্ডার, পঞ্চু কলু, মুকুন্দ মালখণ্ডি, বিষ্টু মিশির, অতুল মুখুজ্যে, ভুবনডাক্তার, আর কুড়িয়ে-বাড়িয়ে ইস্কুলের ছেলেদের নিয়েই টীম হয়। আম্পায়ার থাকে বকদিঘি ড্রামাটিক সোসাইটির প্রম্পটার হরিশ কর্মকার আর আটঘরা উচ্চ-মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের অঙ্কের বুদ্ধদেবস্যার।

একটা গোলমাল অবশ্য দুবছর আগে বুদ্ধুস্যারকে ( কিছু ছেলে আড়ালে বলে ) নিয়ে হয়েছিল। অ্যাসিস্ট্যাণ্ট হেডমাস্টার করার টোপ দেখিয়ে বকদিঘি ইস্কুলের সেক্রেটারি নাকি ওঁকে দিয়ে ম্যাচ জিতে নেয়—তিনটি রান আউট, দুটি এল বি ডবল্যুর সাহায্যে। আমরা অবশ্য এসব কথা একদমই বিশ্বাস করি না। বুদ্ধদেবের মতই বুদ্ধু-স্যার নির্লোভ এবং অহিংস। অপবাদের প্রতিবাদে গত বছর তিনি আম্পায়ার হননি, তাই গোপীনাথ ঘোষকে আমরা নামিয়েছিলাম।

এই বছর দু-মাস আগে আমরা তিনজন ওঁর বাড়িতে যাই। না গিয়ে উপায় নেই। ক্রিকেট-আইন-জানা আটঘরায় কেউ আর নেই। বাইরের কাউকেও নামাতে ভরসা হয় না, কেননা বুদ্ধুস্যারের মত আটঘরা-প্রেমিক তিনি হবেন, এমন কোন গ্যারাণ্টি নেই। হরিশ যতটা বকদিঘির জন্য গাত্রচর্ম পুরু করে ফেলে, তার সঙ্গে তাল দিয়ে বুদ্ধুস্যারও চক্ষুলজ্জা খসিয়ে দেন। রান আউটের বদলে রান আউট, এল. বি. ডবল্যুর. বদলা নিতে এল. বি. ডবল্যু.—এই হচ্ছে তার নীতি। কিন্তু দুবছর আগের ম্যাচটিতে হরিশের দেওয়া দুটি স্টাম্প আউটের (স্ট্রাইকারের পা ব্যাটিং ক্রিজের একবিঘত ভিতরে ) বদলা নিতে না পারায়, তার নামে অপবাদ রটে।

বুদ্ধুস্যার তো আমাদের দূর থেকে দেখেই মাথা নাড়তে শুরু করেছেন।

"নো, নো, নো, আই ওণ্ট স্ট্যাণ্ড অ্যাজ আম্পায়ার। নেএএভার।"

আমরা তিনজন মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে থাকলাম মিনিট দুই।

গলা খাঁকারি দিয়ে অবশেষে পরমেশদা ধরা গলায় বলল, "এবার আমরা, মানে আটঘরা, হেরে যাব।"

বিষণ্ণকণ্ঠে নন্তু দত্ত বলল, "তারকেশ্বর থেকে ব্যাণ্ড পার্টি আনবে বলেছে পতু মুখুজ্যে। এই রাস্তা দিয়েই হয়তো বাজাতে বাজাতে, নাচতে নাচতে যাবে।"

আমি যথাসাধ্য ক্ষুব্ধস্বরে বললাম, "হরিশ একটা অশিক্ষিত মূর্খ যে ইংরিজি জানে না, ক্রিকেট রুলস পড়েনি, সে কিনা এই রকম এক নোব্‌ল গেমে আম্পায়ার হয়ে আমাদের, অর্থাৎ আটঘরাকে বেইজ্জত করে ছাড়বে। তাই দেখতে হবে আমাদের, অর্থাৎ আটঘরার লোকেদের?"

"আপনি কি বলেন? মনে হয় না কি, একজন আইনজ্ঞ, কড়া নির্ভীক, সৎ আম্পায়ার, আপনার মতই কেউ, আর এক এণ্ডে থাকা দরকার?" পরমেশদা কাঁচুমাচু দেখাবার জন্য চশমাটা খুলে ফেলল

"আমি তো সেই কথাই বলছিলাম, বুদ্ধদেবস্যারের মত আম্পায়ার এই ব্লকে, এই সাবডিভিশনে, এই জেলায় আর দ্বিতীয় কে আছে?" নন্তু দত্ত গর্বে তার আটাশ ইঞ্চি বুক তিরিশ পর্যন্ত ফোলাল।

"গোপীনাথবাবু গতবার যা কেলেঙ্কারিটা ক'রে আমাদের, অর্থাৎ আটঘরার, নাম যেভাবে ডোবালেন, সেই নাম আবার টেনে তুলতে কে আর আছে?" প্রশ্নের সঙ্গেই উত্তরটাও বুঝিয়ে দিতে বুদ্ধুস্যারে

দিকে তাকিয়ে আমি গোটা বারো দাঁত ঠোঁট টেনে দেখালাম।

চুপচাপ শুনে যাবার পর উনি শুধু একটি শব্দ করলেন, "হুম।"

আমরা মুখ-চাওয়াচায়ি করলাম। পাষাণে ফাটল তাহলে ধরেছে।

"গোপীনাথ ঘোষ আর যাই করুন, ক্রিকেট হিস্ট্রি তো ক্রিয়েট করেছেন।" বুদ্ধুস্যারের এই গম্ভীর ভঙ্গিটা আর শুধুমাত্র দেখা যায় নল-চৌবাচ্চার অঙ্ক বোঝাবার সময়। "ওঁর ডিসিশ্যন ক্রিকেট আইন রি-রাইট করিয়েছে, উনি ইন্টারন্যাশনালি ফেমড হয়েছেন এটা ভুলে যাচ্চ কেন?"

"আপনিও হিস্ট্রি ক্রিয়েট করবেন; আটঘরাকে ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেট জিওগ্রাফিতে স্থাপন করবেন।" আমি বললাম।

"কিভাবে?"

"আপনার প্রাজ্ঞতা, সুনিশ্চিত সিদ্ধান্ত, যুগান্তকারী ডিসিশ্যন দ্বারা।" নন্তু দত্ত তক্তাপোশে ঘুঁষি মারল। তলা থেকে ঊর্ধ্বশ্বাসে একটা বেড়াল বেরিয়ে গেল।

"কিভাবে তা সম্ভব! সেরকম সিচুয়েশন চাই। আমি অঙ্কের লোক তবু বলছি হিস্ট্রি অলওয়েজ ক্রিয়েটেড বাই সিচুয়েশনস।"

"সিচুয়েশন নিশ্চয় তৈরি হবে। ক্রিকেট ইজ এ গেম অব আন-সার্টেনিটি। দেখবেন হরিশ হয়তো এমন এক ডিসিশ্যন দিল, তাতেই আপনি সিচুয়েশন পেয়ে যাবেন।"

"হুম্ম্।" পাষাণ বিদীর্ণ হবার শব্দ হল।

কোনবারে যা হয়নি এবার আটঘরায় তাই হয়েছে। নেট প্র্যাকটিস।

মাসছয়েক হল শিবশঙ্কর রাহা দারোগা হয়ে এসেছেন আটঘরায়
বত্রিশ বছর আগে উনি পাটনা ইউনিভারসিটির ক্রিকেট ব্লু হন
তারপর চাকরিতে ঢুকে ক্রিকেট ব্যাট প্রায় হাতেই নেননি। আট
ঘরায় এসে এখানকার শান্তিপ্রিয় অধিবাসীরা তাকে হাঁফ ছাড়া
সুযোগ দেওয়ায় তিনি পরিত্যক্ত শখটি আবার ঝালিয়ে নিতে ব্য
হয়ে পড়েন। তাঁর উদ্যোগ প্রেরণা এবং চাপে পড়েই নেটে
ব্যবস্থা।

শিবশঙ্কর মানুষটি গোঁয়ার, অপরের খুঁত খুঁজে বেড়ান, যা মে
করেন সেটাই সর্বোত্তম ধরে নেন, এবং ক্রিকেট ভালবাসেন। আট
ঘরার এলাকার মধ্যে যে-কটি ম্যাচ ইতিমধ্যে খেলা হয়েছে তা
সবকটিতেই দলে ছিলেন।

প্রথম ম্যাচেই তিনি জানিয়ে দেন, পয়েণ্ট ছাড়া আর কোথা
তিনি ফিল্ড করেন না। পরমেশদা তাকে বহুকষ্টে বোঝাতে পারে
আজকালকার বোলাররা পয়েণ্টে আর লোক রাখে না। গাঁইগু
করে অবশেষে তিনি গালিতে ফিল্ড করতে রাজি হন। মোটামু
জায়গাটা পয়েণ্টেরই কাছাকাছি তো! আমরাও ওকে খুশি কর
সর্বদাই তাই বলে থাকি; 'ব্যাকওয়ার্ড-পয়েণ্টে দারোগাবাবু ফি
করবেন' বা 'করছেন' বা 'করুন'।

অত্যন্ত জরুরী মুহূর্তে দারোগাবাবুর অভ্যাস ক্যাচ ফেলা। কি
অন্যে ক্যাচ ফেললে তিনি রক্ষা রাখবেন না। ব্যাট হাতে নিয়ে প্রথ
দিনই তিনি জানিয়ে দেন, ডাকাত ধরতে গিয়ে পিস্তলের গুলি হাঁটু
লাগায়, জায়গাটা জখম আছে। রানার ছাড়া তিনি ব্যাট কর
পারবেন না। বিপক্ষ অধিনায়কদের মধ্যে এখনো পর্যন্ত এমন কাউ
পাওয়া যায়নি, যে আপত্তি করার মত বুকের পাটা দেখাতে পারে

তবে দারোগাবাবুর ব্যাট করার পালা এলেই দেখা যায় আটঘরার অল্পবয়সী খেলোয়াড়রা গুটিগুটি সটকে পড়ার চেষ্টা করছে। কেউই ওঁর রানার হতে চায় না। অবিরত খ্যাচ খ্যাচ করে যাবেন। কেউই ওঁকে খুশি করতে পারে না।

একবার আমিই ঠিক করে দিই : লটারি হবে। যার নাম উঠবে সে দারোগাবাবুর রানার হবে এবং লটারি বিজয়ীর দুর্ভাগ্যের কথা ভেবে বাকিরা প্রত্যেকে তাকে দশপয়সা দেবে। প্রথমবারেই উঠেছিল আমার নাম।

দারোগাবাবুর সঙ্গে মাঠে নেমে স্কোয়্যারলেগ আম্পায়ারের কাছে দাঁড়াই। উনি প্রথম বলটি কভারের দিকে ঠেলে দেওয়া মাত্র আমি 'ই য়ে য়ে স্' বলেই ছুটে রান নিতে যাই। নন্-স্ট্রাইকার বিন্দুমাত্র ব্যগ্র হয়নি ক্রিজ ছাড়তে। আমি অর্থাৎ দারোগাবাবু রান আউট হলেন। মাঠের মাঝে এবং পরবর্তী এক সপ্তাহ উনি আমায় যা-যা বলেছিলেন তা উহ্য থাক্। তবে আড়ালে ছেলেরা বলেছিল : মতিদা আমাদের চিট্ করেছেন, দু'মিনিটের কাজের জন্য উনি পয়সাটা বেশিই নিয়েছেন।"

পরের দুটি ম্যাচেও রান আউট হয়ে দারোগাবাবু এখন নিজের রানার এক কনস্টেবলকে নিয়ে ব্যাট করতে যান। তবে পরমেশদাকে ছেলেরা জানিয়ে রেখেছে বাৎসরিক ম্যাচে এই বিলাসিতাটি চলবে না। অর্থাৎ টীমেরই কাউকে রানার নিতে হবে।

বাৎসরিক ম্যাচের আগের দিন সকালে কলকাতা থেকে হঠাৎ এসে পড়লেন মলয় সিংহ। সাবজজিয়তি করেন। ক্রিকেটে ভীষণ উৎসাহী। এসেই বললেন, "কাল খেলব।"

লাঞ্চের অর্ধেক খরচ দেবেন বলা মাত্র, আমি নিজের জায়গাটি

ছেড়ে ওঁকে টিমে ঢুকিয়ে নিলাম। দুপুরে নেটে এলেন সাবজজ
গ্রামের অনেকেই দেখতে এল তার এলেমদারি। দারোগাবাবু আমা
পাশেই দাঁড়িয়েছিলেন। মলয় সিংহ বল করছেন।

"কোনরকম সারপ্রাইজ নেই বোলিংয়ে। ভীষণ ইরাটিক
লেংথের যে কি গুরুত্ব, সে সম্পর্কে দেখছি একদম ধারণাই নেই
জোরে জোরে বল করলেই কি আর উইকেট পাওয়া যায়? লে
আর ডিরেকশন, এ দুটোই আসল জিনিস। তোমার সাব-জজে
তো ব্রেন বলে কিছু নেই। এর থেকে চণ্ডী কম্পাউণ্ডার অনেক মাথ
খাটিয়ে বল করে।"

দারোগাবাবু আমাকে শুনিয়ে যেতে লাগলেন তাঁর সুচিন্তি
মন্তব্যগুলি। আমি চুপ। এরপর সাব-জজ ব্যাট করতে এলেন।

"সায়ান্স বলে কোন ব্যাপারই নেই দেখছি। ছাখো কাণ্ড
এসেই কিনা হুক করতে গেল! আগে চোখটা সেট করুক, তবে
রিস্কি শট্ নেবে।"

"ব্যাটে-বলে হয়েছে তো।" আমি বললাম।

"হয়েছে মানে? এটা তো ক্যাচ! লংলেগের হাতের মধ্যে গিয়ে
পড়ল।" দারোগাবাবু পিছন ফিরে কাল্পনিক লংলেগের দিকে
তাকিয়ে একটু হাসলেনও। "পরমেশের উচিত ওকে বলে দেওয়া,
কালকের ম্যাচে সেট না হওয়া পর্যন্ত এসব শট্ যেন একদম বাতিল
করে। তবে কি জান, পরমেশের পার্সোনালিটিটা একটু কম,
ক্রিকেট সেন্স্‌টাও। সেদিন দেখলে তো রায়পাড়ার সঙ্গে খেলায়
চণ্ডীকে একবার স্লিপে, একবার ডীপ ফাইন লেগে, একবার লং অনে
দাঁড় করাল। প্রত্যেক ফিল্ডারের নির্দিষ্ট জায়গা থাকা উচিত
বারবার এধার ওধার করালে···ছাখো ছাখো কিভাবে বোল্ড হল

াট-প্যাডের ফাঁক দিয়ে যে হাতিও গলে যাবে !"

"আরে আরে, মাঠে গরু ঢুকে···" বলতে বলতে আমি রথতলার কে দ্রুত এগিয়ে দারোগাবাবুর কাছ থেকে রেহাই নিলাম।

রীতিমত শোভাযাত্রা করেই বকদিঘি এল। দুটি মোটরে এল তু মুখুজ্যের সঙ্গে খেলোয়াড়রা এবং আম্পায়ার হরিশ। টেম্পোয় ল খেলার সরঞ্জাম। আর সার বেঁধে শ'খানেক বকদিঘি সমর্থক।

নন্তু দত্ত ওদের অভ্যর্থনা জানাবার ছলে ছেখে এল কে কে সেছে

"কই শিশিরকে তো দেখলুম না! আম্পায়ারও তো সেই হরিশই সেছে!"

পরমেশদা বলল, "পতুর এটাই কায়দা, তুরুপের তাস আগে দলে না।"

কথাটা ঠিক। টস হবার দশ মিনিট আগে আর একটা মোটর াঁছল এবং তা থেকে নামল শিশির। তৈরী হয়েই এসেছে। ামাদের দিকে তাকিয়ে ও হাসল। নন্তু দত্ত একবার বলেছিল াশিরকে চ্যালেঞ্জ করবে। পরমেশদা আপত্তি করে বলে, পতু কাঁচা হলে নয়, ঠিক একটা ছবি বার করে দেখিয়ে দেবে।

টস হল। দূর থেকে পতু মুখুজ্যের মুখের হাসি দেখেই বোঝা াল কে জিতেছে। আর বলার দরকার নেই কারা ব্যাট করবে। পেনিং বোলার, ছ'ফুট চার ইঞ্চি চণ্ডী কম্পাউণ্ডার যথারীতি সঙ্গে ঙ্গে দশটা ডন আর কুড়িটা বৈঠক দেওয়া শুরু করল। উইকেট-ীপার বকু বোস প্যাড বার করল। দারোগাবাবু হাঁটুতে নী-ক্যাপ রে নিলেন। বুদ্ধদেবস্থার এবং হরিশ কর্মকার গম্ভীরমুখে ধীর

পদক্ষেপে পাশাপাশি রওনা হল উইকেটের দিকে। নামার সং
দুজনেই কঠোরভাবে নিরপেক্ষ—বেলা গড়াবার সঙ্গে সঙ্গে ওরা
থাকবে কি না, সেটা অবশ্য অন্য কথা।

বকদিঘির ইনিংস একটু চাঞ্চল্যকর ভাবেই শুরু হয়। ব্যা
করতে নামে আলুর আড়তদার বিষ্টু মিশির এবং মুখুজ্যেদেরই এক
ইস্কুলে পড়া ছেলে, অরুণ। চণ্ডীর তিরিশ কদম ছুটে আসা প্রথ
বলটিকে অনায়াসেই 'ওয়াইড' বলা যায়। থার্ড স্লিপ যথাসময়ে উ
হয়ে বসে না পড়লে ফুলটসটি অবশ্য বাউণ্ডারিতে পৌঁছত না
বোলিং প্রান্তে আম্পায়ার বুদ্ধদেবস্যার নির্বিকার মুখে দাঁড়িয়ে
হরিশ কর্মকারের ভ্রূ ইঞ্চিখানেক উপরে উঠে কয়েক সেকেণ্ডের জ
কঠিন হয়ে রইল। পরের বলটি নিখুঁত লেংথে, মিড্‌লস্টাম্পের উপর
অরুণের মুখ দেখে মনে হল না, বোল্ড আউট হয়ে সে খুব অখুশি।

খেলতে নামল শিশির। বাকি চারটি বল সে অবহেলায় ছে
দিল, কিন্তু তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণের মধ্যে রেখে। চণ্ডীর দ্বিতীয় ওভারের
সম্মুখীন হল শিশির। পরমেশদার বলে সামিয়ানার ওপর একব
বল ফেলা ছাড়া আগের ওভারে মিশিরজী আর কিছু করেনি। চণ্ডী
প্রথম বলটি পড়ল অফ স্টাম্পের যৎসামান্য, মাত্রই যৎসামান্য বাইরে
সম্ভবত বলটা একটু উঠেছিল, সম্ভবত যতটা জোরে আসবে মা
হয়েছিল ততটা জোরে আসেনি, সম্ভবত শিশিরের মশারির মধ্যে রা
দু-একটা মশা ঢোকায় ঘুমোতে পারেনি, সম্ভবত সে ঠিক করে উঠ
পারেনি বলটা ছেড়ে দেবে না খেলবে। কারণটা যাই হোক, বলটি
দিকে সে প্রায় আনাড়ির মতই ব্যাট এগিয়ে দেয়। ব্যাটের কা
ছুঁয়ে বলটি আলতো লোপ্পাই হয়ে গালির হাতে অর্থাৎ দারোগাবাবু
হাতে পড়ল বটে কিন্তু অবস্থান করল না। মোটা বেঁটে আঙু

গুলোকে কুঁকড়ে মুঠোয় পরিণত করতে তিনি একটু দেরি করে ফেলেন।

সারা মাঠ স্তব্ধ। দারোগাবাবু গভীর চিন্তায় নিমগ্ন হলেন পায়ের কাছে পড়ে থাকা বলটির দিকে তাকিয়ে। তারপর গম্ভীর-স্বরে বললেন, "হায় মা কালী, বই পড়ার চশমাটা পরে কিনা নেমেছি!"

উনি হাত তুলে ইশারা করলেন। ছুটে এল মাঠের মধ্যে এক কনস্টেবল।

"জলদি আমার ব্যাগ থেকে ডিউটির চশমাটা নিয়ে এস।"

মিনিটচারেক পর দারোগাবাবুর চশমা বদল হল। ততক্ষণ খেলা বন্ধ ছিল।

খেলার ভাগ্য যে ক্যাচ নষ্ট হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই বদল হয়ে গেছে, সেটা বুঝতে ওভার দুয়েক সময় লেগেছিল। দু ওভারের মধ্যেই শিশির ২৪-এ পৌঁছে যায় এবং আটঘরার ফিল্ডাররা বাউণ্ডারি থেকে বল কুড়িয়ে এনে প্রতিবারই দারোগাবাবুর দিকে তাকিয়ে বিড়বিড় করে।

লাঞ্চের সময় শিশিরের ১০৪ এবং বকদিঘির চার উইকেটে ১৭৪।

নন্তু দত্ত কাঁদো কাঁদো হয়ে বলল, "কোনদিন এমন হয়েছে মনে পড়ে না মতি, লাঞ্চের আগেই দেড়শোর ওপর রান করল আমাদের এগেনস্টে! তাহলে টি-এর আগে তো সাড়ে তিনশো করে ফেলবে!"

দারোগাবাবু বিরিয়ানির পাহাড়ের মাঝে গর্ত করে তাতে মুরগীর ঝোল ঢেলে একটা হ্রদ তৈরি করায় ব্যস্ত ছিলেন। কথাটা তার কানে পৌঁছতেই কাজ অসমাপ্ত রেখে মুখ তুললেন।

"ভুবনডাক্তারকে দিয়ে চেষ্টা করা উচিত। আমি লক্ষ্য করেছি

ভুবনের বলে শিশির দোনামোনায় পড়ছিল—ছয় মারবে না চার মারবে ভেবে পাচ্ছিল না। এই অবস্থায় স্টাম্পিং চান্স সহজেই এসে যায়।”

“তবে কমন ডিসেন্সি থাকলে,” সাব-জজ মুরগীর একটা ঠ্যাং তুলে নাকের সামনে নাড়তে নাড়তে বললেন, “ওরা নিশ্চয়ই এক-ঘণ্টার মধ্যেই ডিক্লেয়ার করবে।”

ডিক্লেয়ার করতে হল না। একঘন্টার মধ্যেই বকদিঘির ইনিংস শেষ হয়ে গেল ২১৪ রানে। কিভাবে যে ঘটল কেউ জানে না। লাঞ্চের পর শিশির প্রথম ওভারেই অলসভাবে ( অতি ভোজনের জন্যই বোধহয় ) ব্যাট চালিয়ে উইকেটকীপার বকু বোসকে ক্যাচ দিয়ে ফিরে যায়। এরপর দুটি ক্ষীণ এল. বি. ডবল্যু. আবেদনে বুদ্ধদেব-স্থার আঙুল তুলে দেন।

পাশে-বসা পতু মুখুজ্যের দাঁত কড়মড়ানি শুনে আমার মনে হল বুদ্ধদেবস্থার একটু তাড়াতাড়িই তুরুপের তাস ফেললেন। আট-ঘরাকে এরপর ব্যাট করতে হবে এবং হরিশ সমতা রক্ষার জন্য আড়াই ঘণ্টা অন্তত সময় পাবে।

আটঘরার পাঁচ উইকেটে ৯২ রান হবার পর নামলেন দারোগা-বাবু। সঙ্গে রানার পরমেশদা। ক্যাচটা ফেলার পর তিনি যেটুকু মুষড়ে পড়েছিলেন ইতিমধ্যেই তা কাটিয়ে উঠেছেন।

অপরপ্রান্তে চণ্ডী কম্পাউণ্ডার। দারোগাবাবুর ইশারায় সে কাঁচুমাচু মুখে এগিয়ে এল।

“রান যখন নেবে, খবরদার পীচের উপর দিয়ে দৌড়বে না। মনে থাকবে ?”

চণ্ডী মাথা নাড়ল, দারোগাবাবু এরপর গার্ড নিলেন, মিনিট-

.রেক ধরে। তারপর সাইট স্ক্রীনের খুঁত বার করলেন। তাঁর মতে
দিকে দু গজ অন্তত কম রয়েছে। পতু মুখুজ্জে সায় দিতে তিনি
শি হয়ে বললেন, "ক্রিকেট ডেলিকেট গেম। সবাই এটা বোঝে না।"

আটঘরার ইনিংস একশো পার হল প্রধানত দারোগাবাবুর
ন্যই। স্টাম্পের সামনে ব্যাট দিয়ে বল থামিয়ে ফেলার অদ্ভুত
কটা দক্ষতা ছাড়াও খোঁচা দিয়ে মাঝে মাঝে একটা-দুটো রানও
তনি যোগাড় করে ফেলতে পারেন। তার চারটে সিঙ্গল এবং চণ্ডীর
কটি ঝাড়ুতে বাউণ্ডারি থেকে আটঘরা একশোয় পৌছতেই, পরের
লে সে আবার ঝাড়ু চালালো। বলটা ব্যাটের কানায় লেগে
স্কোয়্যার লেগের দিকে সোজা আকাশে উঠল।

মিড-অন পড়িমরি ছুটে এসে ক্যাচ ধরার সঙ্গে সঙ্গেই স্কোয়্যার
লগ আম্পায়ার হরিশের উপর সে পড়ল। মাথায়-মাথায় প্রচণ্ড
াকাঠুকি চণ্ডী আউট, সেইসঙ্গে হরিশ এবং মিড-অনও। দুজনেরই
পাল থেকে রক্ত ঝরছে। দুজনকেই মাঠের বাইরে যেতে হল।

মুশকিলে পড়ল পতু মুখুজ্জে। ওই দুজনের জায়গায় নামবার
ত লোক তার নেই। তার স্কোরারকে আম্পায়ার হিসেবে
মাতে পারে কিন্তু মিড-অনের বদলী হবার মত কেউ নেই।
রমেশদাই উদারকণ্ঠে ওকে বললেন, "যদি আপত্তি না-থাকে
াহলে আমাদের কেউ ফিল্ড করতে পারে তোমাদের হয়ে।"

কি ভেবে পতু মুখুজ্যে রাজি হয়ে গেল। আটঘরার ক্লাস টেনের
াত্র সুব্রত নামল বকদিঘির হয়ে ফিল্ড করতে। চণ্ডীর জায়গায়
াট করতে এসেছেন সাবজজ।

"স্যার, এখুনি তাড়াহুড়ো করবেন না।" দারোগাবাবু চেঁচিয়ে
াবজজকে বললেন, "আগে সেট হয়ে নিন।"

সম্ভবত এই উপদেশ শুনেই সাবজজ প্রথম বলটিতেই ব্যা
হাঁকড়ালেন। একস্ট্রা কভার দিয়ে বল চলেছে। তার পিছ
কাঠবেড়ালীর মত ছুটছে সুব্রত।

ইতিমধ্যে ব্যাটসমান দুজন ও রানারের মধ্যে কয়েকটি চিৎকা
বিনিময় ঘটল। দারোগাবাবু বললেন: 'নো', সাবজজ বললেন
'রান', পরমেশদা বললে ঃ 'ওয়েট', সাবজজ ঃ 'কাম অন', দারোগা
বাবু ঃ 'ইয়েস'; সাবজজ: 'নো', পরমেশদা ঃ 'হারিআপ'।

দেখা গেল সাবজজ এবং দারোগাবাবুর রানার পরমেশদা দুজনে
ছুটতে শুরু করেছে রান নিতে এবং দুজনেই পীচের মাঝামাঝি পৌ
সভয়ে দেখল সুব্রত পরিচ্ছন্নভাবে বলটা কুড়িয়ে নিয়ে ছোঁড়ার জ
উদ্যত। ওরা ইতস্তত করে থমকে গেল।

"স্যার, ছুটুন।" দারোগাবাবু চিৎকার করল।

"গো ব্যাক।" পরমেশদা বলল।

দেখা গেল দুজনেই একই দিকে ছুটছে। সাবজজ ও পরমেশ
পাশাপাশি পৌঁছলেন নন-স্ট্রাইকার প্রান্তে। দর্শকরা মজা পে
হইহই করে উঠতেই ওরা নিজেদের ভুল বুঝে এবার দুজনেই ছুট
স্ট্রাইকার প্রান্তের দিকে। এবং সেই মুহূর্তে উইকেটকীপার গ
কলুর গ্লাভসে উড়ে-আসা বলটি জমা পড়তে দেখে দুজনেই পাশ
পাশি পীচের মাঝে হাল ছেড়ে অসহায়ের মত দাঁড়িয়ে পড়ল।

পঞ্চু কলু রান আউট করার জন্য বেল ফেলতে গিয়েও থমে
গেল। দুজনেই পাশাপাশি দাঁড়িয়ে, কে তাহলে রান আউট হবে
ফ্যালফ্যাল করে সে পতু মুখুজ্যের দিকে তাকাল।

পতু মুখুজ্যে হাত তুলে তাকে প্রথমে বারণ করল। তারপর ভ্
কুঁচকে পরিস্থিতিটা গোলমেলে বুঝে ইশারায় বেল ফেলে দিতে বলল

ঞ্চু কলু বল হাতে তিনটি স্টাম্পকেই জমিতে শুইয়ে দিয়ে 'হাউজ াট' বলে চিৎকার করল।

বোলিং প্রান্তে হরিশের বদলী আম্পায়ার ছেলেটি আঙুল তুলে ঁচিয়ে উঠল : "আউট।"

পরমেশদার বাহু আঁকড়ে ধরে, গায়ে গা লাগিয়ে দাঁড়ানো াবজজ হুঙ্কার দিয়ে উঠলেন, "কে আউট?"

"আপনি স্যার।" দারোগাবাবু এগিয়ে এলেন পীচের মাঝে।

"রাবিশ। আমি কেন আউট হব?"

"তাহলে আম্পায়ারকে জিজ্ঞাসা করা যাক।"

আম্পায়ার ছেলেটি এইবার ফাঁপরে পড়ল। পরমেশদা আর াবজজ পাশাপাশি দাঁড়িয়ে, কাকে সে আউট দেবে?

পতু মুখুজ্যে মুচকি হেসে বলল, "ওরে পরমেশ, গত বছর তো জনকে একসঙ্গে আউট দিয়ে আমাদের হারিয়ে দিয়েছিল তোর াম্পায়ার। এবার আমাদের আম্পায়ারও যদি তাই করে?"

"পারবে না করতে। আইনে নেই।"

সবাই চমকে ফিরে তাকাল। স্কোয়ার লেগ আম্পায়ার বুদ্ধদেব-ার কখন যেন গুটিগুটি এসে দাঁড়িয়েছেন।

"স্ট্রাইকার এণ্ডে স্টামপিং কি রান আউট ডিসিশ্যন দেবে স্কোয়ার লগ আম্পায়ার অর্থাৎ আমি।"

"কারেক্ট।" সাবজজ বললেন। দারোগাবাবুও মাথা নাড়লেন।

"বেশ," পতু মুখুজ্যে কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়াল। "কে আউট াহলে?"

বুদ্ধদেবস্যার চিন্তিতস্বরে বললেন, "ইট ইজ এ হিস্টরিক িচুয়েশন। হঠাৎ একটা ডিসিশ্যন দেওয়া ঠিক হবে না। আইন

ইয়ে এ রকম কোন নজিরের কথা আছে কিনা, সেটা আগে দেখতে হবে। না থাকলে লর্ডস-এ রেফার করতে হবে, তাদের মতামত জানাতে হবে।"

"ততক্ষণ কি আমরা এইভাবে দাঁড়িয়ে থাকব?" কাঁদোকাঁদো হয়ে পড়লেন পরমেশদা।

"নিশ্চয়।" দারোগাবাবু পঞ্চু কলুর দিকে চোখ রেখে ধমক দিলেন পরমেশদাকে। হাতে বল নিয়ে পঞ্চু ভূতলশায়ী স্টাম্পগুলিকে যক্ষের মত পাহারা দিচ্ছে। দুজনের কেউ একপা সামনে কি পিছনে বাড়লেই সে আবার রান আউটের দাবি জানাতে একটা স্টাম্প মাটি থেকে তুলে নেবে।

"আমি তো গোপী ঘোষ নই যে হুট্ করে একটা ডিসিশ্যন দিয়ে দেব! তবে আপনাদের মধ্যে কেউ যদি স্বেচ্ছায় এগিয়ে এসে রান আউট হতে চান—"

"টীমের মুখ চেয়ে, আপনারই আউট হওয়া উচিত।" সাবজজকে লক্ষ্য করে দারোগাবাবু বললেন, "আমি এখন সেট হয়ে গেছি, এখন আমার থাকা দরকার।"

"রাবিশ! কুইক রান এখন দরকার যদি জিততে হয়। আমি এসে প্রথম বলই কি ভাবে-ড্রাইভ করলাম, সেটা নিশ্চয়ই দেখেছেন।"

"আনফরচুনেটলি ব্যাটে-বলে হয়ে গেছে। কিন্তু সবগুলো যে হবে, তার কোন গ্যারান্টি নেই।"

ষোলটি লোক মাঠের মাঝে এবং খেলা বন্ধ রেখে কথা কাটাকাটি করে চলেছে। দর্শকরা প্রথমে উসখুস তারপর চেঁচামেচি শুরু করল। আমি, নন্তু দত্ত এবং আরো কয়েকজন মাঠের মধ্যে এলাম। বুদ্ধদেব-

স্যারকে ডেকে নিয়ে বললাম, "গতিক খুব ভাল নয়। যাহোক একট
ডিসিশ্যন দিন।"

"যা হোক! বলো কি, গড-সেন্ট সিচ্যুয়েশন, হাতছাড়
করা যায়?"

"কিন্তু পাবলিক তো তা শুনবে না।" নন্তু দত্ত উদ্বিগ্নচোখে
দর্শকদের দিকে তাকিয়ে নিয়ে বলল, "ডিসিশ্যন দিয়েছিল বলেই ন
গোপী ঘোষ ইন্টারন্যাশনাল ফেম পেয়েছে। আপনিও দিন, দেখবেন
তারপর দেশেবিদেশে আটঘরার নাম ছড়িয়ে পড়বে।"

বুদ্ধদেবস্যার বিচলিত হলেন। দ্বিধাগ্রস্তকণ্ঠে বললেন, "কিন্
কি বলি বলো তো?"

নন্তু দত্ত কিছু না ভেবেই বলল, "টস করুন। যে হারবে, সে
আউট।"

তাই হয়েছিল। আটঘরা শেষপর্যন্ত ২১ রানে হেরে গেলে
কিছু ছেলে অবশ্য খুশি হয়েছিল টসে দারোগাবাবু হেরে যাওয়ায়
শোনা যাচ্ছে পতু মুখুজ্যে চিঠি লিখেছে লর্ডসে। এখনো জবাব
আসেনি।

# প্রাচীন শিমূল

লোকটা আজও এসেছে। এই নিয়ে পরপর পাঁচদিন

"কি জন্য আসে বল্‌তো এই ভোরবেলায় ?" পল্টুকে বললাম।
াল দেখছিলাম আমাদের দিকে তাকিয়ে মিটমিট করে আবার
সছিলও।"

ফুটবলটা মাটিতে ধাপাতে ধাপাতে পল্টু নিমগাছতলাটার দিকে
কাল। লোকটা ওইখানে বসে রয়েছে। ওইখানেই আমরা
াশাক বদলাই, বুট পরি ও খুলি, প্র্যাকটিসের পর বিশ্রাম নিই,
ঙ্গ নিয়ে-আসা খাবার খাই। এত ভোরে কারখানার এই মাঠটায়
মরা দুজন ছাড়া আর কেউ আসে না। অবশ্য আসার উপায়ও
ই। সারামাঠ পাঁচিলে ঘেরা। শুধু এক জায়গায় পাঁচিলটা
ঙা। শ্রম ও সময় বাঁচাবার জন্য আমরা সেই ভাঙা জায়গা দিয়েই
ঠে ঢুকি। মাঠ থেকে লোকালয় প্রায় সিকি মাইল দূরে। এ
াটে চার-পাঁচ মাইলের মধ্যে ফুটবল খেলার এতবড় মাঠ আর
ই। আমার দূরসম্পর্কের এক আত্মীয় এই লোহা-কারখানার
ারমান। তার সুপারিশে ম্যানেজারের কাছ থেকে অনুমতি
য়েছি, সকালে প্র্যাকটিসের। এ বছর থেকে আমরা দুজনেই ফার্স্ট
িভিশনে খেলব তাই উৎসাহটা বেশিই। গরম পড়তে না পড়তেই
াকটিস শুরু করে দিয়েছি।

"পাগল-টাগল হবে বোধহয়।" পল্টু এর বেশি কিছু বলল না।

গাছতলায় দুজনের ব্যাগ আর বলটা রেখে লোকটাকে এ
মধ্যে না এনে আমরা প্রায় নগ্ন হয়েই খাটো প্যান্ট পরলাম।
পরতে পরতে একবার তাকালাম খোঁচা-খোঁচা আধপাকা দাড়িও
অপরিচ্ছন্ন শীর্ণকায় আধবুড়ো লোকটির দিকে। দুজনেই ঘড়ি
ব্যাগে রেখেছি। আমরা মাঠের মধ্যে থাকব আর এই লে
থাকবে ব্যাগদুটোর কাছে, মনে হওয়া মাত্র অস্বস্তি বোধ কর
ঘড়ি পরেই থাকব কি না ভাবলাম। পল্টুর পক্ষে অবশ্য সম্ভ
কেননা সে গোলকীপার। ওকে প্রায়ই মাটিতে ঝাপ
হয়। লোকটাকে যে অন্য কোথাও বসতে বলব, তাতেও ব
বাধো ঠেকল। ওর সর্বাঙ্গে দারিদ্র্যের তকমা আঁটা থাকলেও,
ঋজু ভঙ্গিতে ঝকঝক চাহনিতে বা গ্রীবার উদ্ধত বঙ্কিমতায় এমন
সহজ জমকালো ভাব রয়েছে, যেটা ছিঁচকে-চোর সম্পর্কে অ
ধারণার সঙ্গে একদমই মেলাতে পারলাম না।

লোকটি শিশুর কৌতূহল নিয়ে আমাদের বুটপরা দেখছে।
ক'দিন খয়েরি লুঙ্গি আর সাদা হাওয়াই শার্ট পরে আসছিল,
দেখি পরনে ঢলঢলে কিন্তু ঝুলে খাটো, মোটা জিনের নীল পাজ
বয়লার বা মেসিনঘরের শ্রমিকরা যেরকমটি পরে। চকোলেট
কলার দেওয়া ফ্যাকাসে হলুদ রঙের সিল্কের যে গেঞ্জিটা পরেছে সে
ঢলঢলে। মনে হয় অন্য কারুর পাজামা ও গেঞ্জি পরে এসেছে

"আপনারা অ্যাংক্লেট পরলেন না যে?" লোকটির হঠাৎ
আমরা দুজনেই মুখ ফেরালাম। পল্টু গম্ভীরস্বরে বলল, "পরার
দরকার নেই, তাই। ওতে সুবিধের থেকে অসুবিধেই বেশি হয়

লোকটির চোখে বিস্ময় ফুটে উঠল। আমাদের পায়ের
তাকিয়ে বলল, "কে বলল সুবিধে হয় না, পরে কখনো খেলেছে

কন্তু উত্তরের অপেক্ষা না করেই আবার বলল, "বড় বড় প্লেয়াররা বাই অ্যাংক্লেট পরেই খেলেছে—সামাদ, ছোনে. জুম্মা, করুণা—কই র তো অসুবিধে হয়নি! ওদের মতো প্লেয়ারও তো আর হল না।"

"আর হবেও না কেননা খেলার ধরনই বদলে গেছে।" এবার ়ামিই জবাব দিলাম।

"গেলেই বা! শুটিং, হেডিং, ড্রিবলিং, ট্যাকলিং, পাসিং, এসব তা আর বদলায়নি!" লোকটি মিটমিট করে হেসে আবার বলল, আজকাল হয়েছে শুধু রকমারি গালভরা নামওলা সব আইডিয়া। সদিন এক ছোকরা আমায় ফোর-টু-ফোর বোঝাচ্ছিল। আরে এতো দখি সেই আমাদের আমলের টু-ব্যাকেরই খেলা! হাফ-ব্যাক দুটো নমে এলেই তো ফোর ব্যাক—"

ওর কথা শেষ হবার আগেই আমি আর পল্টু নিজেদের মধ্যে াওয়া-চাওয়ি করে মাঠে নেমে পড়েছি। রোজই প্রথমে আমরা াঠটাকে চক্কর দিয়ে কয়েক পাক দৌড়ই। শুরু করার আগে পল্টু াপাস্বরে বলল, "গুলিখাওয়া বাঘ। অ্যানাদার ফ্রাসট্রেটেড ওল্ড ুটবলার।"

পাশাপাশি ছুটতে ছুটতে ঘাড় ফিরিয়ে দুজনেই লক্ষ্য করছিলাম লাকটাকে। এক সময় দুজনেই থেমে পড়লাম। বলটা গাছ-লাতে রেখে আমরা দৌড়তে নেমেছি। ইতিমধ্যে সেটিকে নিয়ে লাকটা কাল্পনিক প্রতিপক্ষদের কাটাতে ব্যস্ত। প্রায় ছ'ফুট লম্বা নগবগে শরীরটাকে একবার ডাইনে আবার বাঁয়ে হেলাচ্ছে, পায়ের চটো দিয়ে বলটাকে টানল, বলটাকে লাফিয়ে ডিঙিয়ে গেল, ঘুরে গিয়ে প্রচণ্ড শট্ করার ভান করে পা তুলে আলতো শটে বলটা ডানদিকে ঠেলে দিয়ে ঝুঁকে যেন সামনে দাঁড়ান কাউকে এড়িয়ে

উৎকণ্ঠিত হয়ে দেখতে লাগল বলটা গোলে ঢুকছে কিনা। বল
গড়াতে গড়াতে থেমে যেতেই দু'হাত তুলে হাসতে শুরু করল। ম
হল প্রতিপক্ষ খেলোয়াড়দের ভ্যাবাচাকা মুখগুলো দেখে হা
সামলাতে পারেনি।

পল্টুকে বললাম, "বোধহয় এককালে খেলত।"

নকল আতঙ্ক গলায় ফুটিয়ে পল্টু বলল, "সেরেছে। মিলিটারি
সঙ্গে খেলার গপ্পো শুরু করবে না তো!"

"তোর এইসব বাজে ধারণাগুলো মাথা থেকে তাড়া।" ক্ষুব্ধক
বললাম, "সে আমলে সত্যিই অনেক ভাল ভাল প্লেয়ার ছিল।"

"হ্যাঁ ছিল। গোরারা তাদের ভয়ে ঠকঠক করে কাঁপত। ত
তিরিশ-চল্লিশ গজ দূর থেকে মেরে মেরে গোল দিত। রেকর্ডের খা
খুলে ত্থাখ সেই সব শটের কোন পাত্তাই মিলবে না। বড় জোর
গোল কি দু'গোল, আর বাবুরা খেতেন পাঁচ-ছ গোল!" এই ব
পল্টু আমার জন্য অপেক্ষা না করেই আবার ছুটতে শুরু করল।

আমি মাঠের বাইরে লোকটার দিকে তাকালাম। এক পা
দাঁড়িয়ে অন্য পায়ে বলটাকে মেরে মেরে শূন্যে রাখার চেষ্টা করে
তিন-চার সেকেণ্ডের বেশি পারছে না। অবশেষে বিরক্ত হয়ে বলটা
লাথি মেরে মাঠের মাঝখানে পাঠিয়ে দিল। যখন শুটিং প্র্যাকটি
শুরু করলাম লোকটা মাঠে এসে দাঁড়াল। কারখানার মেশি
শপের দেয়ালটায় খড়ির দাগ টেনে পোস্ট এঁকে নিয়েছি। ক্রশবার
কাল্পনিক। যে সব বল পল্টু ধরতে পারে না, দেয়ালে লেগে মা
ফিরে আসে, লোকটা তুমুল উৎসাহে ছোটাছুটি করে সেই ব
ধরে, যেন ছাত্রদের সামনে শুটিং-এর টেকনিক বোঝাচ্ছে এ
কায়দায় পা দিয়ে মেরে আমায় ফিরিয়ে দিতে লাগল আর সমা

:বক করে চলল।

'উঁহুহু, উপর দিয়ে নয়, মাটিতে, সবসময় মাটিতে রাখতে ব···উপর তোলা মানেই গেল, নষ্ট হয়ে গেল!" উর্ধ্বশ্বাসে বল :তে ছুটে গেল। "আজকাল তো সেইসব ক্লাসিক থ্রু পাশ দেখতেই ই না, কুমারবাবু দিতেন।" আবার ছুটে গেল। "সেদিন ।করাটাকে বলছিলুম, যে ফোর-টু-ফোর বোঝাচ্ছিল···আরে বাবা চ কষে কি ফুটবল খেলা হয় ··মাটিতে মাটিতে, তুলে নয়···হ্যাঁ, ধন অনেক বেশি খেলতে হয় বটে, সে কথা আমি মানি, খাটুনি :ড়েছে···হল না হল না, থ্রু দেবার সময় পায়ের চেটোটা ঠিক :ভাবে, দিন, বলটা আমায় দিন, দেখিয়ে দিচ্ছি।"

বলটা ওকে দিলাম। দূর থেকে পল্টু খিঁচিয়ে উঠল, "আমি কি করে ভ্যারেণ্ডা ভাজব? শট্ কর, শট্ কর।"

লোকটি অপ্রতিভ হয়ে তাড়াতাড়ি বলটা আমার দিকে ঠেলে ল। "দমাদম গোলে বল মারলেই কি ফুটবল খেলা হয়, স্কিল্ও াকটিস করতে হয়।" এই বলে লোকটি ক্ষোভ প্রকাশ করল ট কিন্তু বল ধরে ফিরিয়ে দেওয়ার কাজ বন্ধ করল না। পা ফাঁক র কুঁজো হয়ে দৌড়ে, বলটাকে ধরেই কাউকে যেন কাটাচ্ছে এমন ঙ্গতে পায়ে খেলিয়ে নিয়ে যেন মহার্ঘ একটি পাস দিচ্ছে, আমার মনে বলটা বাড়িয়ে দিয়ে চিৎকার করল, "শ্যুট শ্যুট।" গড়ানে লই শট্ করলাম, ঝাঁপিয়ে পড়া পল্টুর বগলের তলা দিয়ে বলটা চণ্ডগতিতে দেয়ালে লেগে মাঠে ফিরে এল। "গো-ও-ল···ল" ল লোকটি হাত তুলে লাফিয়ে উঠল। শট্‌টির নিখুঁতত্বে আমি নও চমৎকৃত। লোকটি উত্তেজিতস্বরে চেঁচিয়ে বলল, "কাকে বলে দেখলেন তো। আর এই জিনিস আপনারা খেলা থেকে

কিনা তুলে দিয়েছেন! আজকাল কি যে ম্যান-টু-ম্যান খেলা হয়ে
বিউটিই যদি না থাকে তাহলে—"

আমি দেখলাম পল্টু মুখ লাল করে ছুটে আসছে। শি
উঠলাম। পল্টুর মাথা অল্পেই গরম হয়। সামান্য উসকানি
ঘুঁষোঘুঁষি শুরু করে।

"আমরা এখানে এসেছি প্র্যাকটিস করতে," ভারী গ
পল্টু বলল। "আপনাকে তো আমরা ডাকিনি তবে কেন গ
পড়ে ঝামেলা করছেন। খেলা যদি শেখাতে চান, তবে অন্য কা
ধরে শেখান। প্লিজ আমাদের বিরক্ত করবেন না।"

পল্টু গটগট করে ফিরে গেল নিজের জায়গায়। লোকটি অব
হয়ে পল্টুর দিকে তাকিয়েছিল। দেখলাম ক্রমশ মুখটা ফ্যাকা
হয়ে এল। মাথা নামিয়ে গাছতলার দিকে যখন ধীরে ধীরে এগো
ওর ঢলঢলে নীল পাজামা আর কুঁজো পিঠটার দিকে তাকিয়ে ক্ষ
যাওয়া শ্যাওলাধরা একটা পাথরের কথাই মনে এল। আমরা য
নিমগাছতলায় বসে খাচ্ছিলাম, লোকটি তখন উঠে গেল। খে
খেতে পল্টু শুরু করল আমাদের নতুন ক্লাবের ফুটবল সেক্রেটা
গল্প। তখন হঠাৎ চোখে পড়ল লোকটি ধীরে ধীরে ছুটতে
করেছে মাঠটাকে পাক দিয়ে। ঠিক আমরা যেভাবে ছুটি। আ
সঙ্গে পল্টুও অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকল।

একপাক শেষ করে যখন আমাদের সামনে দিয়ে ছুটে গেল,
জ্বলজ্বলে চোখদুটি কঠিনদৃষ্টিতে সামনে নিবদ্ধ। আমাদের
বারেকের জন্যও তাকাল না। সরু বুকটা হাপরের মত ওঠা
করছে। নিশ্বাস নেবার জন্য মুখটা খোলা। পিছন থেকে
ঢ্যাঙা দেহের উপরে রঙের পোঁচের মত চুলভরতি মাথাট

ড়বড় করতে দেখে হাসিই পেল। কিন্তু পরক্ষণেই কষ্ট হল আধবুড়ো
াকটির ওই ধরনের ছেলেমানুষি প্রয়াস দেখে। স্পষ্টই বোঝা
চ্ছে, ও নিজেকে আমাদের সমান প্রতিপন্ন করতে যেন চ্যালেঞ্জ
য়েই ছুটছে বয়সের বাধা ঠেলে ঠেলে। মনে মনে চাইলাম, ছেলে-
নুষের মত অসম প্রতিদ্বন্দ্বিতা ত্যাগ করে এখান থেকে ও চলে যাক।

"টেঁসে না যায়, তাহলে আবার হুজ্জুতে পড়তে হবে।" পল্টুর
বে সত্যিকারের উৎকণ্ঠা কিছুটা ফুটল। লোকটা দেড়পাক ছুটেই
ড়িয়ে পড়েছে। মুখ তুলে হাঁ করে আছে। চোখদুটো ঠেলে
রিয়ে এসেছে। মনে হল আমাদের দিকে বারকয়েক আড়চোখে
াকালও। হয়তো কোলাপ্‌স করে পড়ে যেতে পারে ভেবে আমি
ঠে দাঁড়ালাম। লোকটি সঙ্গে সঙ্গে স্বাভাবিক হাঁটার ভঙ্গিতে
াচিলের ভাঙ্গা জায়গাটার দিকে এগিয়ে গেল। তাই দেখে আবার
ই পেলাম। পল্টু হো হো করে হেসে উঠল।

দিন ছয়-সাত লোকটি এল না। আশ্বস্ত হয়ে ভাবলাম আর
াধহয় আসবে না। কিন্তু লোকটি এল, সঙ্গে তিন-চারটি তালিমারা
াবড়েবে একটি ফুটবল নিয়ে। আমরা যথারীতি প্র্যাকটিস করতে
াগলাম আর তখন সে মাঠের অপরদিকে নিজের বলটি নিয়ে
াল্পনিক প্রতিপক্ষদের নাজেহাল করায় ব্যস্ত রইল। কিন্তু কিছুক্ষণ
রই দেখলাম, বলটিকে পায়ের কাছে রেখে সে আমাদের দিকে
াকিয়ে রয়েছে। একবার বলটা ওর দিকে গড়িয়ে যেতেই চোখদুটো
চক করে উঠল। সামনে ঝুঁকে এগোতে গিয়েও প্রাণপণে
জেকে যেন ধরে রাখল।

"ক'দিন দেখিনি যে আপনাকে?" বললাম নিছকই সৌজন্য-
াত।

"শরীরটা খুব খারাপ হয়েছিল।" গম্ভীর হয়ে বলার চেষ্টা করল

ওকে খুশি করার জন্য বললাম, "দেখুন তো থ্রুগুলো ঠিক হচ্ছে কিনা।"

একটু পরেই ও চেঁচিয়ে উঠল, "ওকি ওকি! হচ্ছে না।" আ ফিরে তাকাতেই আবার বলল, "চটপট করতে হবে, কিন্তু স্পীডে। কিক্ করার সময়ও তাই। পায়ের পাতার ওপর দি দিয়ে। বুটের ডগা মাটির দিকে—এইরকম ভাবে। তারপর ফলে থ্রুটা হবে—এইরকম! করুন তো একবার।"

ফার্স্ট ডিভিসনে খেলতে যাচ্ছি আর এখন কিনা শুট কর প্রাথমিক নিয়ম এইরকম একটা লোকের কাছ থেকে শিখতে হ ভাবতেই বিরক্তিতে মন ভরে উঠল। ওকে অগ্রাহ্য করে আগে মতনই শুট করতে লাগলাম। বারদুয়েক চেঁচিয়ে ও চুপ করে গেল বুঝতে পারছি লোকটির একজন চেলা দরকার, যে ওর উপদেশ শুনবে মান্য করবে, আমরা যে ওর কথা অনুযায়ী কাজ করব না সেটা নিশ্চ বুঝে গেছে।

পরদিন সকালে বৃষ্টি পড়ছিল। আমরা মাঠে এসে দেখি চে জুটে গেছে। থপথপে বোকা চেহারার একটা ছেলে বৃষ্টির মা কাঠের মত দাঁড়িয়ে, বল নিয়ে লোকটার লম্ফঝম্ফ মনোযোগ ক দেখছে। ওর পাগলামি আর উৎসাহ দেখে অবাক হলাম। বি বৃষ্টির জল গায়ে বসবার স্বাস্থ্য বা বয়স ওর নয়। পল্টুকে বললা "নির্ঘাত নিউমোনিয়া হবে লোকটার।"

"হোক্। কিন্তু এটাকে কোত্থেকে ধরে আনল, একটা হাঁ গোবর-গণেশ! সারা জীবনেও তো খেলা শিখতে পারবে না।"

দূর থেকেই আমরা শুনতে পেলাম লোকটির নির্দেশ দেওয়া

যেন ক্লাস লেকচার দিচ্ছে। "বলের উপর দিয়ে যদি এইভাবে যাও" —ছোট্ট একটা লাফ—"তাহলে কিস্সু হবে না। তোমায় করতে হবে কি এইভাবে···তারপর এইভাবে নিয়ে যাবে। তাহলে দোনামনায় পড়বে তোমার অপোনেন্ট।"

ছেলেটি একাগ্র হয়ে দেখছে আর প্রত্যেক কথায় ঘাড় নেড়ে যাচ্ছে কিন্তু লোকটি ওকে বল নিয়ে চেষ্টা করতে বলছে না। "এইবার দেখাচ্ছি কিভাবে পায়ের চেটো দিয়ে পাস দিতে হয়।" বলটা কাদায় আটকে গেল। লোকটি ছুটে গিয়ে ড্রিবল করতে করতে বলটাকে আনল। ছেলেটি একই জায়গায় দাঁড়িয়ে। বৃষ্টি ফোঁটা থুতনি দিয়ে গড়িয়ে পড়ছে। চুল কপালে লেপটে। শার্টের ভিতর থেকে গায়ের শাদা চামড়া ফুটে উঠেছে। "এইবার দেখ ডগা দিয়ে কি করে বল তুলতে হয়।" তুলতে গিয়ে পা পিছলে লোকটি পড়ে গেল। ছেলেটি কিন্তু হাসল না। বরং লোকটিই হেসে উঠল। এই সময় হঠাৎ বৃষ্টির বেগ বাড়তে আমরা প্র্যাকটিস বন্ধ করে ফিরে গেলাম। যাবার সময় দেখি লোকটি ছেলেটির চারপাশে বল নিয়ে ঘুরছে আর নাগাড়ে কথা বলে যাচ্ছে।

পরদিন পণ্টু প্র্যাক্টিসে এল না। চোট পেয়ে ওর হাঁটু ফুলে উঠেছে। একাই হাজির হলাম মাঠে। নিমগাছতলায় লোকটি বসে। চেলাটি তখনো আসেনি। আমায় দেখে হেসে বলল, "আর একজন কই?"

কারণটা বললাম। তারপর কথায় কথায় ওর কাছে জানতে চাইলাম, কি করেন, কোথায় থাকেন এবং ফুটবল খেলতেন কোন ক্লাবে। উত্তর দিতে ওর খুব আগ্রহ দেখলাম না। শুধু জানলাম মাইলদুয়েক দূরে ভট্‌চাযপাড়ায় ভাইয়ের বাড়িতে থাকেন।

াবিবাহিত। যুদ্ধে গেছলেন। ফিরে এসে কারখানায় ওয়েল্ডারের াজ করেন। প্লুরুসি হওয়ায় কাজ ছেড়ে দেশের বাড়িতে গিয়ে যৎ-ামান্য জমিজমা নিয়ে দিন কাটাচ্ছিলেন। এখন আর ভাল লাগছে তাই ছোটভাইয়ের কাছে এসেছেন, কিন্তু এখানেও নানান াসুবিধা—অশান্তি। ভাবছেন, আবার দেশেই ফিরে যাবেন।

"হাঁ, খেলতুম।" কাশতে সুরু করল। পিঠটা বেঁকে গেল াশির ধমকে। বারকয়েক থুথু ফেলে আমার দিকে তাকিয়ে াসল। "বরাবর বুট পরেই খেলেছি। একবছর কালীঘাটেও হলুম, জোসেফ খেলত তখন। নাম শুনেছেন ওর?"

আমি মাথা নাড়লাম। কি একটা বলতে যাচ্ছিল আবার কাশি ুরু হতেই থেমে গেল। গতকাল বৃষ্টিতে ভেজার মাশুল। এই র্বল শরীরে আজ যদি খেলা দেখাতে মাঠে নামে তাহলে নির্ঘাত ারা পড়বে, এই ভেবে ওকে বললাম, "আজ বোধহয় আপনার শিষ্যটি আসবে না। বরং আপনি বাড়িই ফিরে যান।"

"না, না, আসবে, ঠিক আসবে। বলেছি ওকে ফুটবলার তৈরি রে দেবই, তাতে যদি জীবন যায় তো যাবে। আমি যে পদ্ধতি েয়েছি তার আর মার নেই। বুঝলেন, যে কোন বস্তুর উপরে যদি চ্ছার প্রভাব ছড়ান যায় তাহলে সফল হবেই।" দুবার কেশে েয়ে আবার বলল, "বস্তুটি যদি কাঁচা হয়, তার মানে যদি অল্পবয়সী য় তাহলে যে কাউকেই দুর্দান্ত প্লেয়ার করা যাবে। আমার এখন য়স হয়ে গেছে, নয়তো নিজের উপরই পদ্ধতিটা পরখ করতাম।"

ছেলেটিকে ভাঙ্গা পাঁচিলের ফাঁক দিয়ে আসতে দেখলাম। লাকটি তখন মাঠের অন্যধারে প্রায় পত্রহীন একটা শিমুলগাছের িকে তাকিয়ে বলল, "আচ্ছা, গাছ তো তার পাতার মধ্য দিয়ে যা

শুষে নেয় তাই দিয়েই খাদ্য তৈরি করে বেঁচে থাকে। তাই যা
হবে তাহলে ওই গাছটা কি করে বেঁচে রয়েছে ?" ওর কণ্ঠস্বরে যে
ব্যক্তিগত সমস্যার দায় ধ্বনিত হল—"পাতাই নেই তাহলে বেঁ
আছে কি করে ?"

হঠাৎ লোকটিকে আমার ভাল লাগতে শুরু করল এবং দুঃখ
বোধ করলাম। যে পদ্ধতিতেই খেলা শেখাক এই গাব্‌দা চেহারা
ছেলেটি যে কোনদিনই ফুটবলার হতে পারবে না, তাতে আ
নিঃসন্দিগ্ধ। ছেলেটাকে একবারও বলে লাথি মারতে না দি
লোকটি নিজেই লাফালাফি করে যাচ্ছে। ছেলেটি সামান্য চনম
হলে নিশ্চয় এভাবে কাঠের মত দাঁড়িয়ে থাকতে পারত না
এরকম হাঁদা ছেলে না পেলে লোকটি তাকে শিষ্যও বানাত না।

প্রায় আধঘণ্টা বসে থেকে লোকটির কর্মকাণ্ড দেখলাম। ছেলে
চলে যেতেই আমার খাবারটা ওর দিকে এগিয়ে ধরে বললাম, "আ
তো আজ প্র্যাকটিস করলাম না, তাছাড়া খিদেও নেই।"

ভ্রু কুঁচকে বলল, "করুন না, আমি গোলে দাঁড়াচ্ছি।"

"না থাক, আজ মন লাগছে না।"

লোকটি আর কথা বাড়াল না। খাবারের প্যাকেটটা নি
পকেটে রাখল। কোন কুণ্ঠা দেখলাম না। বিনয় দেখিয়ে ধন্যবাদ
জানাল না। আমরা একসঙ্গেই মাঠ থেকে বেরোলাম, হাঁটে
হাঁটতে লোকটি একসময় বলল, "আমার কি মনে হয় জানে
ফুটবলের তুল্য আর কোন খেলা পৃথিবীতে নেই। ক্রিকেট-হকি
ব্যাডমিন্টন-টেনিস যাই বলুন, সবই একটা ডাণ্ডা নিয়ে খেলতে হয়
ডাণ্ডা হাতে মানুষ! তার মানে প্রায় সেই বনমানুষের যুগে
ব্যাপার। ফুটবল হচ্ছে সভ্যমানুষের খেলা, এর মধ্যে অনেক সায়ে

াছে। সেটা রপ্ত করতে পারলে···ভাল কথা আপনার কি কোন াতিল ছেঁড়া বুট আছে? কাল দেখলেন তো কেমন পিছলে পড়ে গলুম। বুট হলে আরও ভাল ক'রে ডিমনস্ট্রেট করতে পারি।"

মাথা নেড়ে জানালাম, দেবার মত বুট আমার নেই। শুনে ।পসোসে টাগরায় জিভ লাগিয়ে শব্দ করল। ওর গালদুটি লক্ষ্য বলাম, আগের থেকে পাণ্ডুর এবং বসে গেছে। ঢলঢলে নীল াজামাটায় গতদিনের কাদা শুকিয়ে আটকে রয়েছে। তালিমারা লটা দুহাতে বুকে চেপে ধরে মাথা ঝুঁকিয়ে ওর হাঁটা প্রায় বাচ্চা হলের মত দেখাচ্ছে। কিন্তু চোখদুটিতে দারুণ উত্তেজনা। মনের ধ্যে হয়তো প্রতিপক্ষকে একের পর এক ড্রিবল করে এখন কাটিয়ে লেছে। আমাকে কোনরকম বিদায় না জানিয়েই মোড়ে পৌছে াপনমনে সে নিজের বাড়ির পথ ধরল।

পরের সপ্তাহে ছেলেটিকে প্রথমবার বল নিয়ে নড়াচড়া করতে খলাম। দেখে মনে হল ওর থেকে এই আধবুড়ো লোকটি জোরে ক্ করতে পারে, ছুটতে পারে, লাফাতে পারে। ছেলেটি কেন যে ত জিনিস থাকতে ফুটবল খেলা শিখতে এল ভেবে অবাক হলাম। াধঘণ্টা পরে, ছেলেটি চলে যাওয়ামাত্র বললাম, "কি রকম মনে চ্ছে, হবে-টবে কিছু?"

"নিশ্চয়।" লোকটি প্রচণ্ড উৎসাহে বলল, "ঠিক করেছি এবার কে নামাব। যা কিছু শিখিয়েছি, সেগুলো খেলায় ব্যবহার করার ত উপযুক্ত হয়েছে বলেই মনে হচ্ছে। ওর স্কুলের একটা ট্রায়াল াচ আছে এই শনিবার, ও খেলবে। আমি টাচ লাইন থেকে কার মত বলে বলে দেব।"

"আগে কখনো কি ওকে খেলতে দেখেছেন?"

"না, তার দরকারই বা কী। এতদিন ধরে যা যা শিখিয়েছি সেটাই আমার দেখা দরকার। উন্নতি করেছে তাতে সন্দেহ নেই, নইলে ট্রায়াল ম্যাচে চান্স পাবে কেন!"

এবার আমি লোকটির জন্য হতাশা বোধ করলাম। নিজের কল্পনার জগৎকে আরোপ করার চেষ্টা করছে বাস্তব জগতের উপর ফলাফল ব্যর্থতা ছাড়া আর কিছু হতে পারে না। মনশ্চক্ষে দেখলাম কুঁজো হয়ে, পা ফাঁক করে লোকটি টাচ লাইন ধরে ছুটোছুটি করছে আর বিচ্ছু ছেলেরা ওর পিছনে ছুটছে, ভ্যাংচাচ্ছে, হাসছে, জামা ধরে টানছে। মাস্টারমশায়রা বলছেন, পাগলটাকে সরিয়ে দিতে দেখতে পেলাম, অপমানে লজ্জায় ওর জ্বলজ্বলে চোখদুটো জলে ভরে উঠেছে। মাঠ থেকে চলে যাচ্ছে মাথা নামিয়ে আর একপাল ছেলে ওর পিছু নিয়েছে।

"এখনই ওকে ম্যাচে নামানোটা কি একটু তাড়াতাড়ি হয়ে যাচ্ছে না?" যথাসম্ভব নম্রকণ্ঠে বললাম। "মাত্র ক'দিন তো শেখাচ্ছেন?"

"আমি হিসেব রেখেছি, মোট পঁচিশ ঘণ্টা ওকে কোচ করেছি ছেলেদের ফুটবলে ভাল স্ট্যাণ্ডার্ডে রিচ করতে পঁচিশ ঘণ্টার কোচিংই যথেষ্ট।"

"কিন্তু এ ছেলেটাকে তো পাঁচশো ঘণ্টা কোচ করলেও কোন স্ট্যাণ্ডার্ডে পৌঁছতে পারবে না।"

প্রথমে অবাক হয়ে আমার দিকে তাকাল। তারপর হেসে মাথা নাড়তে নাড়তে বলল, "ইচ্ছেটা যে কি ভয়ঙ্কর ব্যাপার আপনি বুঝবেন না। আপনি ইচ্ছে করুন সামাদ কি ছোনে কি গোষ্ঠ পালের মত খেলবেন···কিংবা আজকাল যাদের খুব নাম শুনি

পেলে, ইস্‌টুবিও ··তাহলে ঠিক তৈরি হয়ে যাবেন।”

এই নিয়ে আর কথা বাড়ালাম না। ভাবলাম, যা খুশি করুক আমার তা নিয়ে মাথাব্যথার দরকার নেই। বরং শিক্ষা পেলে ওর জ্ঞানচক্ষু ফুটবে। লোকটি এরপর এক সপ্তাহ অনুপস্থিত রইল। রোজই পন্টুর সঙ্গে প্র্যাকটিসের সময় ভাঙ্গা পাঁচিলটার দিকে তাকাতাম। এই বুঝি আসে। পরে মনে হত, ছেলেটা নিশ্চয় ওকে ডুবিয়েছে তাই আমাদের কাছে মুখ দেখাতে লজ্জা পাচ্ছে বলেই আসছে না।

একদিন লোকটিকে আবার দেখলাম। নিমগাছতলায় দাঁড়িয়ে আমাদের প্র্যাকটিস দেখছে। পরনে লুঙ্গি আর হাওয়াই শার্ট, মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি। ওকে দেখতে পেয়েছি বুঝতে পেরে ধীরে ধীরে চলে যাচ্ছিল, দৌড়ে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, “সেদিনকার ট্রায়াল ম্যাচের খবর কী?”

লোকটি একবার থমকাল তারপর চলতে চলতেই বলল, “শুধু ইচ্ছেতেই হয় না, কিছুটা প্রতিভাও থাকা দরকার। আমারই ভুল হয়েছে।” এরপর ঘাড় ফিরিয়ে আমার দিকে একবার তাকাল। আমি ওর চোখে গাঢ় প্রত্যাবর্তন কামনা দেখতে পেলাম। ওর চলে যাওয়া দেখে মনে হল, একটা আহত জন্তু গভীর অরণ্যের নির্জনে প্রাণ বিসর্জন দেবার জন্য যেন হামাগুড়ি দিয়ে এগোচ্ছে।

কিছুদিন পর বাজার যাবার পথে ছেলেটিকে দেখতে পেলাম। রাস্তায় দাঁড়িয়ে ওর থেকেও কমবয়েসী ছেলেদের ডাংগুলি খেলা দেখছিল। লোকটির খবর জিজ্ঞাসা করতেই ও বিরক্তস্বরে বলল, “কে জানে। বোধহয় আবার অসুখ-বিসুখ হয়েছে।”

“কোথায় থাকে জান?”

"জানি, তবে আমি কিন্তু নিয়ে যেতে পারব না। আমায় দেখলে
এমনভাবে তাকায় যেন ভস্ম করে ফেলবে। আচ্ছা, কি দোষ বল
তো, মাঠে এমন কাণ্ড শুরু করল যে ছেলেরা ওর পেছনে লাগল
এজন্য কি আমি দায়ী?"

"মোটেই না।"

"তাহলে! আমি যদি খারাপ খেলি তাই বলে সকলের সামনে
অমন হাউ হাউ করে কাঁদবে একটা বুড়ো লোক?"

"তুমি বরং দূর থেকে বাড়িটা দেখিয়ে দাও। সেটা পারবে তো
অধৈর্য হয়ে বললাম।

"তা পারব।" ছেলেটি দ্বিধাগ্রস্তস্বরে বলল।

কথামত দূর থেকে বাড়িটি দেখিয়ে দিয়েই ছেলেটি চলে গেল
জায়গাটা আধাবস্তি। তিনদিকে টালির চাল দেওয়া একতলা ঘর
মাঝখানে উঠোনের মত খোলা জায়গা। অনেকগুলো বাচ্চা ছুটো
পাটি চিৎকার করছে। তার পাশেই খোলা নর্দমা, থকথকে পাঁকে
ভরা। একধারে লাউয়ের মাচা। চিটচিটে ছেঁড়া তোষক বাঁশে
ঝুলছে। আস্তাকুঁড়ে একটা হাঁস ঠোঁট দিয়ে খুঁচিয়ে খাদ্য বার
করছে। একজন স্ত্রীলোক এসে একটি বাচ্চার পিঠে কয়েকটি চড়
মেরে তাকে টানতে টানতে নিয়ে যাচ্ছিল। আমার প্রশ্নে, ব্যাজার
মুখে একটা ঘরের দিকে আঙুল দেখিয়ে চলে গেল। একটু কৌতূহলও
প্রকাশ করল না।

ঘরের দরজাটি পিছন দিকে। ঘরের পাশ দিয়ে যাবার সময়
জানলা দিয়ে ঘরের মধ্যে তাকালাম। দেয়ালে অজস্র ক্যালেণ্ডার
আর তোরঙ্গ, কৌটো, ঘড়া, বিছানা, মশারি প্রভৃতিতে বিশৃঙ্খল ঘরের
কোণায় তক্তাপোশে লোকটি দেয়ালে ঠেস দিয়ে খাড়া হয়ে বসে।

তাকিয়ে রয়েছে সামনের দেয়ালে। পাশ থেকে দেখতে পেলাম থুতনিটা এমনভঙ্গিতে তোলা যেন কিছুই ধর্তব্যের মধ্যে আনছে না। গালের হাড় উঁচু হয়ে চোখদুটিকে আরো ঢুকিয়ে দিয়েছে। মৃত্যু ওর শরীরে কোমল স্পর্শ বুলিয়ে দিচ্ছে এবং লোকটি আরামে আচ্ছন্ন হয়ে আছে মনে হল।

হঠাৎ ও ঘাড় ফেরাল। চোখাচোখি হল আমার সঙ্গে। মাত্র কয়েক হাত দূরেই দাঁড়িয়ে আছি কিন্তু ওর চোখে কোনরূপ ভাবান্তর প্রকাশ পেল না। রিক্ত কৌতূহলবর্জিত শূন্য চাহনি। মনে হল নিষ্পত্র প্রাচীন এক শিমুলের কাণ্ড, ক্ষয়প্রাপ্ত পাথরের মত যার বর্ণ, গতিহীন সঞ্চরণে প্রত্যাবর্তনরত। আমি পরিচিতের হাসি হাসলাম। ওর চোখে তা প্রতিফলিত হল না।

# ভগ্নস্তূপে সন্ধ্যামণি

জানতাম না বিজন দত্ত এই স্যানাটোরিয়ামে রয়েছে। স্কুল ছুটির পর, ডাক্তার বসুরায়ের কোয়ার্টার্সে মাঝে মাঝে যাই, যদি থাকেন তো গল্প ক'রে সময় কাটাতে। সেদিন উনি বললেন, "তুমি তো ফুটবল পাগল, বিজন দত্তের নাম শুনেছ ?"

আমাকে চিন্তায় বিব্রত হতে দেখে বললেন, "ফরটি-এইট লণ্ডন অলিম্পিকে ইণ্ডিয়ান ফুটবল টীমে নাকি স্ট্যাণ্ডবাই ছিল। আমি অবশ্য বলতে পারব না কথাটা সত্যি কি মিথ্যে তবে কথাবার্তা ফুটবলারদের মতোই রাফ্, মুখে অনর্গল খিস্তি, আর গোঁয়ার। পঞ্চাশের কাছাকাছি বয়েস কিন্তু এককালে যে লম্বাচওড়া দারুণ স্বাস্থ্য ছিল সেটা বোঝা যায়।"

মনে পড়ল, ছোটবেলায় দাদাদের কাছে বিজন নামটা শুনেছি। ও যখন পা ভেঙে খেলা ছেড়ে দেয় তখনো আমি ময়দানে ফুটবল দেখতে যাওয়া শুরু করিনি। তাছাড়া মোহনবাগান ক্লাবে বিজন দত্ত কখনো খেলেনি। সুতরাং আমার পক্ষে না চেনাই স্বাভাবিক। ওয়ার্ড এবং বেড নম্বর জেনে নিয়ে একদিন বিকেলে আলাপ করতে গেলাম।

ঘরে চারটি মাত্র বেড। দেয়াল ঘেঁষে ওর খাট। তার পাশে দরজা, বারান্দায় যাওয়া যায়, মাথার নিচে দু-হাত রেখে চিত হয়ে শুয়েছিল। লম্বায় ছ'ফুটের বেশি বই কম নয়। চুল কদমছাঁট

র্ধক পাকা, মাথাটি ঝুনো নারকেলের মতো দেখাচ্ছে। খাটের
শে দাঁড়াতেই কৌতূহলটা বিস্ময়ের রূপ নিয়ে ওর ঘন ভ্রূয়ের নিচে
ল জ্বল ক'রে উঠল।

"আপনার নাম শুনে আলাপ করতে এলাম।" সঙ্কোচ কাটাবার
ন্য হাসতে গিয়ে বুঝলাম এ-লোকের কাছে সৌজন্য দেখানো
রর্থক।

"কেন, আমি কি ফিল্ম-স্টার না টেস্ট-প্লেয়ার?"

দমে না গিয়ে বললাম, "ফুটবল ভালবাসি, রেগুলার খেলা
খিও।"

"জীবনে কখনো তো বলে পা দেননি।" কনুইয়ে ভর দিয়ে উঠে
তে বসতে বিজন দত্ত বলল, "চেহারা দেখেই বুঝেছি।"

কথাটা নব্বুই ভাগ সত্যি, তাই প্রতিবাদ করার মতো জোর
লাম না

"গত বছরই, আপনার মতো পটকা চেহারার এক ছোকরা এল,
টবল সেক্রেটারির বন্ধুর ছেলে। আমাকে বলা হল একটু দেখতে।"
জন দত্ত পিটপিটিয়ে হাসল। "সকালে প্রথম দিন প্র্যাকটিসে
সতেই কুড়ি পাক দৌড়তে বললুম, পাঁচ-ছ পাক দিয়েই বাছাধনের
মরে হাত। গোলের মুখে উঁচু ক'রে বল ফেলে ওকে হেড করতে
ললুম আর আমার স্টপারকেও বলে রাখলুম কোঁতকা ঝাড়তে।
থম বার উঠেই পাঁজর চেপে বসে পড়ল। তারপর ট্যাকলিং
্যাকটিস। ছোকরার একটা ভালো ডজ ছিল। দুবার আমায়
টিয়ে বেরলো। থার্ড টাইমে, লাট্টুর মতো পাক খেয়ে সাইড-
াইনের দশ হাত বাইরে ছিটকে পড়ল। পরদিন থেকে আর
াসেনি

বিজন দত্ত দুই উরুতে চাপড় মেরে পুরনো মোটর স্টার্ট দেব
মতো শব্দ ক'রে হেসে উঠল। দেখলাম নিচের পাটির সামনের
দাঁত নেই।

"ফুটবল পুরুষমানুষের খেলা। বুঝলেন, সেইভাবেই আম
খেলেছি। মার দিয়েছি, মার খেয়েছি। বাঁ হাঁটুর দুটো কার্টিলেজ
নেই, আর এই পায়ের সিনবোনটা—" বিজন দত্ত লুঙ্গিটা হাঁটু পর্য
তুলে ডান পা ছড়িয়ে দিল। ঘন লোমের মধ্যে দিয়েও কয়েক
কাটা দাগ দেখতে পেলাম।

"এই পা-টা ভাঙার পরই খেলা ছাড়তে হল।"

কোনোরকম প্রয়াস ছাড়াই আমার মুখে বোধহয় স্বস্তির ভা
ফুটে উঠেছিল। বিজন দত্ত কঠিনচোখে আমার দিকে তাকি
বলল, "আপনি কি করেন?"

"এখানকার স্কুলে পড়াই, সায়ান্স।"

"মাস্টার! আমিও মাস্টারি করি, ফুটবলের। আমার লেখাপ
ক্লাস ফাইভ পর্যন্ত।"

"আপনি কি এখন কোচ করেন?"

"শোভাবাজার ইয়ং মেনস। গতবার ফাস্ ডিভিশানে ওঠার ক
ছিল, ওঠেনি।" বলতে বলতে বিজন দত্তর মুখ চাপা রাগের আক্রম
মুচড়ে যেতে লাগল। দাঁতে দাঁত চেপে বলল, "ব্যাটা টাকা দি
ম্যাচ কিনল। জানতো খেলে আমার টীমের কাছ থেকে পয়ে
নিতে পারবে না।"

"কার কথা বলছেন?"

"রতন সরকার। ব্যাটা খেলার আগের দিন একশো টাকা নি
আমার গোলকিপারের বাড়ি গেছে; স্টপারের বৌটা মরো-মরো

সপাতালে ভর্তি করিয়ে দেবে বলেছে, দুটো হাফব্যাক্‌কে টেরিলিন
া-ট দিয়েছে। নয়তো প্রদীপ সঙ্ঘের সাধ্যি ছিল কি চ্যাম্পিয়ান
পাঁচটা ম্যাচ কিনেছে হাজার টাকা দিয়ে। নিজেকে কোচ
ল বড়াই করে! বরাবর, সেই যখন আমরা একসঙ্গে খেলতাম
খন থেকে ওকে জানি, পয়লা নম্বরের জোচ্চর। হাত দিয়ে কতবার
গোল করেছে! পেনাল্টি এরিয়ার মধ্যে মাটিতে পড়ে ছটফটিয়ে
মন কাতরাতো যে মনে হতো যেন ওকে দারুণ মেরেছে। এইভাবে
নেক পেনাল্টি আদায় করেছে। গোলকিপার বল ধরতে লাফাচ্ছে,
ন অমনি প্যাণ্ট টেনে নামিয়ে দিল। যত রকমের ছ্যাঁচড়ামো
াছে কোনোটাই বাদ দিত না।"

শুনতে শুনতে আমি হেসে ফেলেছিলাম, ওর যত রাগ রতন
কারের বিরুদ্ধে অথচ নিজের টীমের যারা ঘুষ নিল তাদের সম্পর্কে
কটি কথাও বলল না। আমার হাসি দেখে স্থিরদৃষ্টিতে তাকিয়ে
লল, "আপনি কোন্ ক্লাবের সাপোর্টার?"

"মোহনবাগানের।"

অশ্রাব্য একটা গালি দিয়ে বলল, "কাঁপে, বুঝলেন ছোট টীমের
ছেও ভয়ে কাঁপে। তিনটে ক্লাবের অফার আছে আমার কাছে।
খনো ঠিক করিনি কোন্‌টা নোব, তবে নোবই। রতনকে এমন
ক্ষা দেব যে জীবনে ভুলবে না। আর মোন্‌বাগান ইস্‌বেঙ্গলের
াছ থেকে পয়েণ্ট নেবই। ইজিলি পয়েণ্ট নেব। একশো টাকা
জি রাখছি।"

বললাম, "যদি রতন সরকার আবার আপনার প্লেয়ারকে ঘুষ
াওয়ায়?"

ওর চোখে দপ্ ক'রে ওঠে রাগটা ধীরে ধীরে বিচলিত হতে থাকল,

তারপর স্তিমিত হয়ে পড়ল। কাঁধ ঝাকিয়ে শুধু বলল, "ও সব পায়ে
ওর কাছে খেলাটা কিছু নয়, যেনতেন ক'রে জেতাটাই বড় কথা।

ঘড়ি দেখে বললাম, "আমার ট্রেনের সময় হয়ে গেছে, এবার
কলকাতা ফিরব। মাঝে মাঝে এসে যদি গল্প করি, বিরক্ত হবেন
না তো?'

"না না, রোজ আস্থন না, তা হলে তো বেঁচে যাই, সময় কাটতেই
চায় না। বাড়ি থেকে রোজ রোজ বৌয়ের পক্ষে আসা তো
সম্ভব নয়।"

চোখে মুখে কাতরতা ফুটে উঠতে দেখে, এই অমার্জিত কিন্তু সরল
রাগী উদ্ধত লোকটির জন্য মায়া বোধ করলাম। ঘরের অন্য তিন
জনের ভাবভঙ্গি দেখে বুঝলাম কেউই ওকে পছন্দ করে না। করার
কথাও নয়। আমিও করতাম না। কিন্তু এমন একটা বন্য-প্রকৃতি
শক্তির বিচ্ছুরণ ওর কণ্ঠস্বর, হাত বা মাথা নাড়া, চাহনি এবং
মেজাজের দ্রুত পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে ঘটে যাচ্ছিল, যেটা আমার
কাছে খুবই আকর্ষণীয় বোধ হল। বললাম, "বইটই পড়তে চান তো
এনে দিতে পারি।"

"বই!" কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে মাথা নেড়ে বলল, "নাহ্, পড়তে-
টড়তে ভাল লাগে না। একবার মোহনবাগানের সঙ্গে খেলার আগের
দিন রাত্রে—" থেমে গিয়ে একগাল হেসে বলল, "সকালে আর
উঠতেই পারি না। দারুণ ডিটেকটিভ গপ্পো, ছাড়তে পারিনি আর
সারারাত জেগে—"

"সেদিন খেলেছিলেন কেমন?"

"আরে খেলব কি, শুরু হবার দশ মিনিটের মধ্যেইতো ম্যাকব্রাইড
আমায় মাঠ থেকে বার ক'রে দিল। সামান্য পা চালিয়েছিলুম।

ক্ষতি সামান্য, তেমন কিছু লাগেওনি। ফ্রি কিক দিয়েছে, বেশ ভাল কথা, কিন্তু সেইসঙ্গে মাঠ থেকে বারও ক'রে দেওয়া?"

ওর গলায় প্রকৃত ক্ষোভ ফুটে উঠল। আমার দিকে যেভাবে তাকিয়ে, তাতে একটা কিছু মন্তব্য না ক'রে উপায় নেই। বললাম, রেফারি বোধহয় নার্ভাস ছিল তাই বেশি কড়া হয়ে নিজেকে সামাল দিতে গিয়ে—"

"না না, ম্যাকব্রাইড খুব ভাল রেফারি, নার্ভাস হবার লোকই নয়। আসলে আমি ঠিক বুঝতে পারি না কোন্ পর্যন্ত গেলে, বুঝলেন, কোথায় নিজেকে আটকাতে হবে, একদমই জানি না। এতে আমার অনেক ক্ষতি হয়েছে। আমি অলিম্পিকে যেতে পারলুম না শুধু এই জন্যেই। তেল দিতে পারি না, জিবের আড় নেই। কত্তাদের মুখের ওপরই যাচ্ছেতাই ক'রে বলতুম। খেলা দেখিয়ে টীমে আসব, ম্যাটাদের পা চেটে ব্যাকডোর দিয়ে নয়

ধীরে ধীরে বিষণ্ণ হয়ে এল বিজন দত্তের কণ্ঠস্বর। চাহনিতে অনুশোচনার আভাস দেখতে পেলাম। বললাম, "তাইতো উচিত। পুরুষমানুষরা তো তাই করে। এতে আপনার বিবেক চিরদিন পরিষ্কার থাকবে, আপনি মাথা উঁচু ক'রে চলতে পারবেন। আর মোহন সরকারের মতো লোকেরা আপনাকে দেখে কেঁচো হয়ে যাবে।"

ওর মুখে চাপা সুখের আমেজ ফুটে উঠতে দেখলাম, সেইসঙ্গে চাপা রাগও। দাঁত চেপে বিড় বিড় ক'রে বলল, "একবার পাই··· এখান থেকে আগে ফিরি।"

ফেরার সময় ট্রেনে বসে হঠাৎ খেয়াল হল, সারাক্ষণ আমি দাঁড়িয়েই ওর সঙ্গে কথা বলেছি। বিজন দত্ত আমায় বসতে বলেনি।

মনে হল, ভদ্রতার অভাব নয়, আসলে ও সৌজন্যের ব্যাপার একদমই জানে না।

মাঝে মাঝে যেতাম ওর কাছে। লক্ষ্য করলাম আমার জন্য বিজ দত্ত অপেক্ষা করে। বিছানা থেকে ওঠার অনুমতি পেয়েছে, বারান্দা এসে দাঁড়িয়ে থাকে। স্যানাটোরিয়াম গেটের কাছে আমায় দেখলে বারান্দা থেকে হাত নাড়ে। টুলটা টেনে বসামাত্রই শুরু হয় অনুযো কেন দু-দিন আসিনি। আমাকে ওর ভাল লেগে গেছে। আ বারান্দায় গিয়ে বসতাম, ও গল্প ক'রে যেত—কুড়ি-পঁচিশ বছর আগে কোনো একটি গোলের, খেলার, খেলোয়াড়দের, দারুণ কো জেতার কিংবা জোচ্চুরির শিকার হয়ে হেরে যাওয়ার। ওর সম গল্পের মধ্যেই একটা কথা স্পষ্ট হয়ে উঠত—তুমি যেমন শক্ত ফুটবল তেমনি শক্ত আর ফুটবল শক্ত যেহেতু জীবনটাই শক্ত।

একদিন গিয়ে দেখি, বিজন দত্ত বিছানায় শুয়ে, তার সামনে টু বসে তাঁতের রঙিনশাড়ি-পরা, শ্যামবর্ণা স্থূলকায়া এক মহিলা মুখখানি গোলাকার, কপালে বড় সিঁদুরটিপ, গলায় ও ঘা পাউডার, হাতে শাঁখা ও লোহা ছাড়া কিছু প্লাস্টিক চুড়ির স একগাছি সোনার চুড়িও। দেখেই বুঝলাম, এ বিজন দত্তর স্ত্রী বেশি বয়সেই বিয়ে করেছে বিজন দত্ত। একটি মাত্র ছেলে, বছ দশেক বয়স। "ব্যাটার পায়ে সট্ আছে, দু পায়েই।"—এর বে ছেলে সম্পর্কে কিছু বলেনি। স্ত্রী সম্পর্কে শুধু: "ভাগ্যিস খে ছেড়ে দেবার পর বিয়েটা করেছি, নয়তো খেলা শিকেয় উঠত।"

মহিলার মুখের বিরক্তি আর বিজন দত্তর হাত নেড়ে অসহ ভঙ্গিতে তাকে বোঝানোর চেষ্টা দেখে মনে হল, ওরা বোধ ব্যক্তিগত কোনো ব্যাপারের ফয়সালায় ব্যস্ত। আমাকে দেখে

ায়নি বিজন দত্ত। ওখান থেকেই আমি ফিরে গেলাম। পরদিন
র সঙ্গে ঘণ্টাখানেক গল্প করলাম কিন্তু একবারও বলল না, কাল ওর
ী এসেছিল।

দিনচারেক পর, আমি টুলে বসে আছি, বিজন দত্ত বাথরুমে।
র্ঘাঙ্গী এক বিধবা মহিলাকে ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে ইতস্তত করতে
খলাম। বয়স মনে হল পঁয়ত্রিশের কাছাকাছি। কাঁধে একটি
ল। চোখা নাকের তুপাশে দীর্ঘ চোখ। চাপা গলায় দরজার
রের খাটে বইয়ে মগ্ন রোগীটিকে কি জিজ্ঞাসা করতেই সে আঙুল
য়ে আমাকে দেখিয়ে দিল। আমার কাছে এসে মহিলা মৃতুকণ্ঠে
াল, "বিজন দত্ত কি এই বেডের ?"

"হ্যাঁ, বাথরুমে গেছেন, আপনি বসুন।" টুল ছেড়ে আমি উঠে
ড়লাম। অপরিচিতার সঙ্গে চুপচাপ বসে থাকা অস্বস্তিকর, তাই
রান্দায় গিয়ে দাঁড়ালাম। মিনিটতুয়েক পরই বিজন দত্তর হর্ষোৎ-
া কণ্ঠ শুনলাম— "আরে মিনু !"

বারান্দা থেকে দেখতে পেলাম মহিলার চোখের সলজ্জ হাসিটুকু
ধীরে ধীরে মুছে গিয়ে ব্যাকুলতায় গভীর হয়ে উঠল। ফিসফিস
ক'রে কি বলতেই বিজন দত্ত তুই উরুতে চাপড় দিয়ে চেঁচিয়ে উঠল,
"গোলি মারো তোমার অসুখকে। ফাইন আছি।" এর পর ওর
কণ্ঠস্বর আর শুনতে পেলাম না। আড়চোখে মাঝে মাঝে তাকিয়ে
দেখি নিচুগলায় কথা বলে যাচ্ছে অনর্গল, নিঃশব্দে হেসে উঠছে, এক
য় আপেল খেতে দেখলাম

চলে যাবার জন্য আমি ঘরে ঢুকে ওকে বললাম, "আজ চলি।"

আমার দিকে একবার তাকিয়ে, বিজন দত্ত এমন ভঙ্গিতে মাথাটা
লিয়ে দিল যেন অনুমতি দিচ্ছে। ফেরার পথে ট্রেনে বসে আজই

প্রথম ওর উপর বিরক্ত হলাম। দিনসাতেক আর স্যানাটোরিয়া
মুখো হলাম না। স্কুল থেকে সোজা স্টেশনে চলে যাই। ওর স্ত্রী
দুদিন দেখলাম ট্রেন থেকে নামতে। একদিন সঙ্গে ছেলেটিও ছিল
সেই বিধবা মহিলাকে দেখলাম, স্যানাটোরিয়ামের দিক থে
সাইকেল-রিক্শায় স্টেশনে এল। টিকিট কিনে, প্ল্যাটফর্মের প্রা
গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকল। কলকাতা থেকে একটা ট্রেন এসে দাঁড়া
ঘোমটায় মুখ আড়াল দিল। একদিন ডাঃ বসুরায়ের কোয়ার্টা
গেলাম। তিনি ব্যস্ত ছিলেন কয়েকজন নিকট আত্মীয়কে নিয়ে
চলে আসছি তখন আমায় বললেন, "তোমার বন্ধু যে খোঁজ করছিল
আমাকে অবাক হতে দেখে আবার বললেন, "সেই ফুটবলার, বিজ
দত্ত। এখন তো ওকে বাইরে বেড়াবার পারমিশন দেওয়া হয়েছে।

ডাক্তার ও কর্মচারীদের কোয়ার্টার্সগুলোর পিছনে একটা পুকু
তার ধারেই এক চিলতে জমি। এখানকার বাচ্চা ছেলেরা তা
ফুটবল খেলে। পুকুরের কিনারে সীমানা-পাঁচিলের খানিকটা ভা
আছে জানি। সেখান দিয়ে বেরোলে মিনিটখানেকের পথ ক
হাঁটতে হয়। তাড়াতাড়ি স্টেশনে পৌছবার জন্য ওইদিকে যাচ্ছি
হঠাৎ ধমকানো গলার 'বাঁ দিক কভার করো, বাঁ দিক' চিৎকার শু
দেখি কালো হাফপ্যান্ট আর গেঞ্জি পরে বিজন দত্ত, বল নি
ধাবমান একটা বছরবারো বয়সী ছেলের পাশাপাশি ছুটছে আ
হাত নেড়ে নিজের ডিফেণ্ডারদের নির্দেশ দিচ্ছে। দেখেই আমি কাঁ
হয়ে গেলাম। একটা ধাক্কা দিলেই রোগা ছেলেটা লাট্টুর মতো
পাক খেয়ে ছিটকে পড়বে।

বিজন দত্ত পা দিয়ে আঁকসির মতো বলটা টেনে নিয়ে, দাঁড়ি
হাসতে লাগল। ছেলেটা কি করবে ভেবে না পেয়ে ফ্যালফ্যা

ক'রে তাকিয়ে থাকল। "দাঁড়িয়ে কেন, কেড়ে নাও আমার কাছ থেকে, কাম্ অন, চার্জ মী।" ছেলেটি ভয়ে ভয়ে এগিয়ে এসে বলে লাথি মারতে যেতেই বিজন দত্ত ঘুরে গিয়ে বলটাকে আড়াল ক'রে দাঁড়াল। "পুশ মী, জোরে, জোরে, আরো জোরে ধাক্কা দাও, ভয় কি··· নাঃ" হাল ছেড়ে দেবার ভঙ্গিতে বলল, "ভয় পেলে ফুটবল খেলা হবে না। যখন পারে না তখন পুরুষমানুষ কি করে? হয় মারে নয় মরে। তুমি আমাকে মেরে বল কেড়ে নাও। ইজ্জতের খেলা ফুটবল, মরদের খেলা।"

ছেলেরা দাঁড়িয়ে হাঁ-ক'রে ওর কথা শুনছে। এই সময় ও আমাকে দেখতে পেল। হাত তুলে অপেক্ষা করার ইঙ্গিত জানিয়ে, এগোতে এগোতে ছেলেদের বলল, "এবার তোমরা খেলো। কিন্তু মনে থাকে যেন, যখনই খেলবে জান লড়িয়ে দিয়ে খেলবে।"

সারা মুখ পরিশ্রম ও উত্তেজনায় লাল হয়ে উঠেছে, হাপরের মতো ওঠানামা করছে বুক, সারা দেহের রোম ঘামে সেঁটে গেছে চামড়ার সঙ্গে। কাছে এসেই বিজন দত্ত বলল, "পারলুম না আর। ঘাস দেখলে গরু মুখ না দিয়ে থাকতে পারে!"

"অন্যায়, আপনি খুবই অন্যায় করেছেন। এখনো পুরোপুরি সেরে ওঠেননি, অথচ দৌড়ঝাঁপ শুরু ক'রে দিয়েছেন। যদি রিল্যাপ্স করে?"

আমার ধমকটা যেন বেশ ভালই লাগল ওর। হাত নেড়ে বলল, "কিসস্যু হবে না। আমি সেরেই গেছি। কদিন আসেন নি কেন?"

আমার মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে হো হো ক'রে হেসে উঠল বিজন দত্ত। পুকুরের সিমেন্ট বাঁধান ঘাটে এসে আমরা বসলাম। একটা কুকুর চাতালে কুণ্ডলী হয়ে ঘুমোচ্ছে। পুকুরের ওপারের ঘাটে কাপড় কাচছে দুজন স্ত্রীলোক। আকাশে মৃদু কোমল রৌদ্রের

বেশ। বাতাস ধীরে বইছে। ঘাটের পাশে অজস্র হলুদ সন্ধ্যামণি ফুটে। বিজন দত্ত কপাল থেকে ঘাম চেঁছে ফেলে হাসল। বললাম, "আপনার কেমন কাটছে?"

"আমার?"

বিজন দত্ত যেন বিব্রত হল! উঠে গিয়ে একটা কঞ্চি কুড়িয়ে কুকুরটাকে খোঁচা দিল। 'ক্যাঁউ' ক'রে উঠে কুকুরটা লেজ নাড়তে নাড়তে কয়েকহাত সরে গিয়ে আবার বসে পড়তেই বিজন দত্ত বাতাসে কয়েকবার জোরে কঞ্চিটা নাড়ল। কুকুরটা বোধহয় এসবে অভ্যস্ত। ভয় পেল না, শুধু অপেক্ষা করতে লাগল। বিজন দত্ত ফিরে এসে বসল। "আমি লেখাপড়া শিখিনি, চাকরি করি বলতে গেলে বেয়ারারই। তখন তো ফুটবলাররা দশ-পনেরো হাজার ক'রে টাকা পেত না, গাড়িভাড়া ছাড়া একটা পয়সাও নয়, এখনকার মতো চাকরিও নয়।"

আকাশের আলো দিনের এই শেষবেলায় খুব তাড়াতাড়ি ম্লান হয়। বিজন দত্তকে শীর্ণ এবং অসহায় দেখাচ্ছে। আমি ওর পাংশু মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতে না পেরে চোখ রাখলাম জলের উপর আবছা নারকেলগাছের ছায়ার উপর।

বললাম, "আর বোধহয় বেশিদিন এখানে আপনাকে থাকতে হবে না।"

"হ্যাঁ, টেম্পারেচার তো কদিন ধরেই অফ-সাইড করছে না। এভাবে বন্দী-জীবন আর ডাক্তারদের হুকুম মেনে আর চলতে পারছি না। মাঝে মাঝে ভাবি, এখানে আমি কি করছি? একদিনের জন্যও কখনো শরীর খারাপ হয়নি, একদিনের জন্যও নয়। হাস-পাতালে গেছি শুধু কার্টিলেজ আর ভাঙা পায়ের জন্য, ব্যস্।"

"এই অসুখটা বাধালেন কি ক'রে ?"

"কি ক'রে! ডাক্তার বলেছিল বেশি খাটুনির জন্যই নাকি। অথচ পঁচিশ বছর ধরেই আমি এইভাবে খেটে আসছি। তাতে কি বলল জানেন ? আপনি তো আর আগের মতো আর ছোকরা নেই, বয়স যে বেড়েছে। ঠিক্, কিন্তু আমি বুড়োও হইনি। হয়েছি কি ?"

ওর দিকে তাকিয়ে সেই মুহূর্তে মনে হল, বিজন দত্ত নিজের চোখে বরাবরই তরুণ থেকে যাবে। বার্ধক্যকে স্বীকার করা ওর পক্ষে কখনোই সম্ভব হবে না। "মাসখানেক বড়জোর, তারপরই ফিরে গিয়ে আবার শুরু করব ছেলেদের নিয়ে। ফাস ডিভিশানে সামনের বার উঠতেই হবে। পরশুর কাগজে দেখলুম আমরা সাত গোল খেয়েছি।"

শেষ বাক্যটি বলার সময় মনে হল, ওর মুখটা যন্ত্রণায় কালো হয়ে উঠল, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই সামলে নিয়ে বলল, "আজকালকার ফ্যাশান হয়েছে উইংব্যাক উঠে গিয়ে গোল দিয়ে আসবে! আমি কখনো ওদের তা করতে দিই না। উঠতে পারে ঠিকই কিন্তু পাল্টা অ্যাটাক হলেই বাবুরা আর চটপট নামতে পারে না। বোধহয় তাই করেই গোল খেয়েছে। আমি থাকলে এটা হতো না। একবার চারটে ম্যাচ আমি বসিয়ে রেখেছিলুম আমার স্টপারকে, কথা শোনেনি বলে।"

পরদিন আমি খানিকটা উত্তেজিত হয়েই হাজির হলাম। বিজন দত্ত তখন সদ্য ঘুম থেকে উঠেছে। বিছানায় পা ঝুলিয়ে বসে। হ্যাণ্ডবিলটা ওর চোখের সামনে ধরে বললাম, "এই দেখুন, প্রদীপ সঙ্ঘ

পরশু রোববার এখানে এক্সিবিশন ম্যাচ খেলবে লোকাল ইলেভেনে
সঙ্গে ।”

ক্ষুধার্তের মতো কাগজটা ছিনিয়ে নিয়ে গোগ্রাসে প্রথম থেকে
শেষপর্যন্ত পড়ে বিজন দত্ত বলল, “আমি দেখতে যাব, মাঠটা কতদূরে
টিকিট ওখানে গিয়ে পাওয়া যাবে তো ?”

“মাঠ প্রায় মাইলদেড়েক । কিন্তু অত দূর যাওয়া-আসার ধক
সহ্য করার মতো শরীর এখনো তো আপনার হয়নি !”

“আমার শরীরের ব্যাপার আমি বুঝব, তা নিয়ে আপনাকে মাথ
ঘামাতে হবে না ।” রুক্ষস্বরে বিজন দত্ত বলল, “রতন নিশ্চয়ই আস
ওর টীমের সঙ্গে । সকলের সামনে অপমান করব ।”

ঠিক সেই সময়ই বিধবা মহিলাটি ঘরে ঢুকল । আমার মুখে এ
যাওয়া কথাগুলিকে বহু কষ্টে চেপে রেখে উঠে দাঁড়ালাম । স্যানা
টোরিয়াম গেট থেকে বেরিয়েই দেখি ছেলেকে নিয়ে রতন দত্তর স্ত্রী
আসছে । ওকে দেখে মনে মনে অদ্ভুত একটা উল্লাস বোধ করলাম
বাছাধন আজ মোহনবাগান-ইস্টবেঙ্গল ম্যাচ দেখুক ! স্টেশনে এ
দেখি অনেকক্ষণ বসে থাকতে হবে কলকাতার ট্রেনের জন্য । বিধব
মহিলাটি আমার একটু পরেই স্টেশনে পৌঁছল । মুখ বিবর্ণ এব
বিরক্তি মাখানো । আমার দিকে একবার তাকিয়ে প্ল্যাটফর্ম-প্রান্তে
বেঞ্চে গিয়ে বসল । উনি বিজন দত্তর কে হন, সেটা আমার কা
এখনো পরিষ্কার নয় । তবে অনাত্মীয় যে, এটা বোঝা যায় । এ
মহিলা এবং বিজন দত্তর স্ত্রী কখনো একসঙ্গে আসেন না ।

রবিবার ট্রেন থেকে নেমে সোজা মাঠে চলে গেলাম । আসতা
না । প্রদীপ সঙ্ঘ এমন কিছু টীম নয়, যার খেলা দেখার জন্য ছুটির দি

কলকাতা থেকে ছুটে আসব। বস্তুত, ফার্স্ট ডিভিশনে খেললেও, কী ওদের জার্সির রঙ জানি না। কিন্তু মনে হল, বিজন দত্ত খেলা দেখতে আসবেই আর রতন সরকারের সঙ্গে কিছু একটা বাধাবে। দুজনকে মুখোমুখি দেখার লোভেই বোধহয় এসেছি।

পৌঁছে দেখি প্রচণ্ড ভিড়। বাস, রিক্‌শা, গরুর গাড়ি, সাইকেলে দূর গ্রাম থেকেও লোক এসেছে। মাঠটা টিন দিয়ে ঘেরা হয়েছে। প্রদীপ সঙ্ঘ উঠেছে মাঠের কাছেই এক ব্যবসায়ীর বাড়ি। সেখান থেকে হেঁটে আসবে। তারা যে গেট দিয়ে মাঠে ঢুকবে সেখানে অল্পবয়সীদের ভিড়। হঠাৎ চোখে পড়ল বিজন দত্ত সেই গেটের কিছু দূরে অধীরভাবে ঘোরাফেরা করছে। আমি কাছে গেলাম না। স্কুলের দুটি ছাত্র সিগারেট লুকিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে লাজুক হাসতেই ভিড় থেকে দূরে সরে গেলাম।

প্রদীপ সঙ্ঘের খেলোয়াড়রা আসতেই হুড়োহুড়ি পড়ে গেল গেটের কাছে। দূর থেকেই দেখলাম, বেঁটে, কালো, কুতকুতে ধূর্ত-চোখ, মোটাসোটা একটি লোককে লক্ষ্য ক'রে বিজন দত্ত এগোচ্ছে। আমি তাড়াতাড়ি ওর কাছাকাছি হবার চেষ্টা করলাম। ওদের প্রাথমিক কথা শুনতে পেলাম না। শুধু দেখলাম বিজন দত্ত অচঞ্চল শান্তভঙ্গিতে কি বলতেই, লোকটার মুখে অস্বস্তি ফুটল, কাঁধ ঝাঁকিয়ে পাশ কাটাবার চেষ্টা করছে। বিজন দত্ত পথরোধ ক'রে দাঁড়াল। লোকটি বিরক্ত ও বিস্মিত হয়েও ঘনিষ্ঠস্বরে বলল, "তোর অসুখ হয়েছে শুনেছিলুম, এখন কেমন আছিস?"

"ভালই। তোকে দেখে আরো ভাল লাগছে।" বিজন দত্ত চারপাশের উদ্‌গ্রীব মুখগুলোর উপর মৃদু হেসে চোখ বোলাল। "তারপর, রতন, এবারও কি টাকা দিয়ে ম্যাচ কিনে ফাস ডিভিশানে

চ্যাম্পিয়ান হবার মতলব করেছিস নাকি ?"

"তার মানে ?" রতন সরকার তেরিয়া মেজাজে বললেও ওর চোখে ভীত ভাব দেখলাম।

"সেই কথাটা জিজ্ঞাসা করতেই তো এসেছি। খেলে তো সতেরোটা ম্যাচে সাত পয়েণ্টও তোর টীম করতে পারত না। গড়ের মাঠে সবাই তোর কেরামতি জানে।"

"তুই এসব কি বলছিস, বিজন! পথ ছাড়।" রতন সরকার ব্যস্ততা দেখাল। ভিড়ের মধ্যে থেকে দু-একটা চাপা ব্যঙ্গাত্মক মন্তব্য ওর উদ্দেশে ছোঁড়া হয়েছে। বিজন দত্ত চাপা খুশিতে আরো গলা চড়িয়ে বলে উঠল, "এক মাঘে শীত পালায় নারে পালায় না। সামনের বছরে আমরা ফাস ডিভিশানে যাবই আর—টেরিলিন প্যাণ্ট দোব, বেঙ্গল টীমে চান্স ক'রে দোব, বৌকে হাসপাতালে ভর্তি ক'রে দোব, এইসব ক'রে কটা ম্যাচ জিততে পারিস দেখব।"

"প্রত্যেকটা ম্যাচই আমরা খেলে জিতেছি, ক্লিন্‌লি অ্যাণ্ড অনেস্টলি।" রতন সরকারও গলা চড়াল।

"হ্যাঁ, ঘুষ দিয়ে।"

"মুখ সামলে, বিজন! তোর কোচিংয়ের কেরামতিতে দু-দুটো টীম ফার্স্ট ডিভিশান থেকে নেমেছে; কোথাও পাত্তা না পেয়ে তাই সেকেণ্ড ডিভিশানের টীম ধরেছিস। এখন নিজের মুখ রক্ষার জন্যে অন্যের গায়ে কাদা না ছিটোলে বাঁচবি কি ক'রে, বল!"

বিজন দত্তকে দেখে আমার মনে হল এইবার ও রতন সরকারের উপর ঝাঁপিয়ে পড়বে। মুখ সাদা হয়ে গেছে। ঠকঠক ক'রে কাঁপছে। এই উত্তেজনা ওর অসুস্থতার পক্ষে ক্ষতিকর। এইবার

আমি ওর হাত চেপে ধরলাম। ঝট্‌কা দিয়ে আমার হাত ছুঁে
ফেলে দিল।

রতন সরকার তখন অতিদ্রুত গেট অতিক্রম ক'রে ভিতরে ঢুকে
যাচ্ছে দেখে হাঁফ ছেড়ে বললাম, "চলুন, এইবার খেলা শুর
হবে।"

"না, দেখতে হয় আপনি যান। আমি ফিরে যাব এখন।" একা
আগের উত্তেজিত সেই উচ্চস্বর অবসাদে স্তিমিত। চোখের দিকে
তাকিয়ে ভয় হল। অদ্ভুত এক শূন্যতা ভেসে উঠেছে দুই চোখে
চতুর্দিকের জনতা ও কোলাহল ওকে যেন স্পর্শ করছে না।

ওকে সাইকেল-রিক্‌শায় তুলে স্যানাটোরিয়ামে ফেরার পথে
জিজ্ঞাসা করলাম, "ডাক্তারকে বলে এসেছেন তো?"

শিথিলভাবে পিছনে হেলান দিয়ে বিজন দত্ত মাথা নেড়ে মৃদু
স্বরে বলল, "ডাক্তারবাবু রাজি হয়নি। বলেছিল, যদি প্লুরি
বাধাতে চান তাহলে যেতে পারেন। আমি লুকিয়ে এসেছি
অনেকটা হাঁটতে হয়েছে।"

বলতে বলতে বিজন দত্ত কাশতে শুরু করল। কাশি থামা
পর লক্ষ্য করলাম শ্বাস-প্রশ্বাস ভারি হয়ে উঠেছে। শরীরটা কুঁকড়ে
রিক্‌শার হাতল চেপে ধরে ক্রমশ ওর মাথাটা বুকের কাছে নে
আসতেই প্রাণপণে তুলে ফ্যাকাশে মুখে বলল, "বয়সটা যদি
আপনার মতো হতো।" তারপর সারাপথে আর একটিও কথ
বলেনি।

পরদিন গিয়ে শুনলাম, রাত্রি থেকেই ওর দেহতাপ একশোয়
কাশির ধমকে ঘরের বাকি তিনজনের ঘুম কয়েকবার ভেঙে গেছিল

াক্তারবাবু ক্রুদ্ধস্বরে জানিয়েছেন, প্লুরিসি হলে তিনি মোটেই
বাক হবেন না।

"ডাক্তারবাবুর কথা শুনলে ভালই করতুম। এইসব রোগ নিয়ে
খলা করাটা উচিত হয়নি। রতনটাই হয়তো শেষপর্যন্ত জিতে যাবে,
ামার বোকামির জন্য। জানেন, এই রকম মাথা গরম করার জন্যই
ামার কিছু হল না।" বিজন দত্ত মাথাটা কাত ক'রে বাইরে
াকিয়ে রইল। কিছুক্ষণ পর বলল, "তুটি টীম আমার জন্যই নেমে
গল এ কথাটা কিন্তু পুরো সত্যি নয়। একটা ছেলেও খেলতে
ানে না, ফুটবল সেন্স নেই। আমি একা আর কতটা সামাল
তে পারি!"

ডাঃ বসুরায়ের কাছে খোঁজ নিলাম। স্পুটাম পরীক্ষা ক'রে
জিটিভ হয়েছে। বিজন দত্তর ক্ষিধে কমে গেছে, চোখতুটি ক্রমশ
সে যাচ্ছে, ওজন দ্রুত কমছে। ওর স্ত্রী এখন রোজই আসছে।
বিষণ্ণমুখে বসে থাকে আর চাপাস্বরে মাঝেমাঝে বলে, "তোমার
দিন যাওয়া উচিত হয়নি। তুমি জানতে এতে তোমার ক্ষতি
বে।" ইতিপূর্বে বিজন দত্তর মুখে 'এ. পি', 'পি. পি', 'রিফিল', 'পি.
. এস', 'থোরা' প্রভৃতি শব্দগুলি কখনো শুনিনি। এগুলির উল্লেখ
ক'রে সে যেন তার রোগের অস্তিত্বকে উপেক্ষা করত। কিন্তু এখন
ার মুখে মাঝে মাঝে অসুখের কথা শুনতে পাই। কথা কম বলে।
কদিন স্কুল যাবার পথে সকালে, বিধবা মহিলাটিকে দেখলাম,
কনো মুখে হেঁটে চলেছে স্যানাটোরিয়ামের দিকে।

নানান দাবিতে তখন বাংলাদেশে শিক্ষক আন্দোলনের প্রস্তুতি
লেছে। আমিও সংগঠনের কাজে জড়িত। অবস্থান ধর্মঘট হবে

রাজ্যপাল ভবনের সামনে। পরপর কয়দিন বিজন দত্তকে দেখতে যেতে পারিনি। একদিন গিয়ে দেখি ওকে অন্য একটি ঘরে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। দেখা করা নিষেধ। ডাঃ বসুরায় বললেন, "উই আ গোয়িং টু কোল্যাপ্‌স দ্য আদার লাং।"

দিনচারেক পর আবার গেলাম, দুপুরে। এক মিনিটের জন্য দেখা করার অনুমতি পেলাম, কথা বলা বারণ। বিজন দত্ত চিত হয়ে একদৃষ্টে সিলিংয়ে তাকিয়ে। গালদুটি বসে গেছে একদা যে বিপুল শক্তি এই দেহ ধারণ করত তার ধ্বংসাবশেষ মাত্র অবশিষ্ট।

"কি খবর?" ফ্যাসফ্যাসে স্বরে বিজন দত্ত বলল।

"কথা বলবেন না।" নার্স ছোট্ট ক'রে ধমক দিল। হাত তুলে ওকে ব্যস্ত না হবার ইঙ্গিত ক'রে বিজন দত্ত আমাকে বলল, "পুকুর ধারে ওরা রোজ খেলে?"

জানি না খেলে কিনা, তবু ওকে খুশি করার জন্য বললাম, "রোজই খেলে।"

"ওদের মধ্যে একটা ছেলে আছে দেখবেন, দারুণ ফুটবল সেন্স

নার্স এবার আমায় বলল, "আপনি বাইরে যান, নয়তো উনি কথা বলে যাবেন।"

আমি যাবার জন্য ঘুরছি, শুনলাম টেনে টেনে বলছে, "ভেবেছি ছেলেটাকে তৈরি করব।"

স্টেশনের পথে হেঁটে যেতে যেতে, ওর কথাই ভাবলাম। চোখে বারবার ভেসে উঠল, একা ঘরে প্রাচীন ভগ্নস্তূপের মতো পড়ে থাকা দেহটিকে, শীর্ণ হাতটির ধীরগতি উত্তোলনভঙ্গি, নিশ্বাস নিতে নিতে দমবন্ধ ক'রে কথা বলা। আমি ঠিক বুঝতে পারছিলাম না ওর সে

য প্রাণশক্তি, যার ফলে ওকে দুর্ভেদ্য মনে হতো, মৃত্যু সেখানে ফাটল রয়েছে কিনা।

দিনপাঁচেক পর, বিকেলে, স্যানাটোরিয়ামের দিকে যাচ্ছি। বতের বিকেলের আকাশ ঘন নীল, বহুদূর পর্যন্ত তার উজ্জ্বলতা াপ্ত। নিকটের একটি বাড়ি থেকে কোমল নারীকণ্ঠের সংগীতের ব ভেসে এল। মন্থরগতিতে মোড় ফিরলাম। এবার সোজা াস্তা। স্যানাটোরিয়ামের গেট দেখতে পাচ্ছি। হঠাৎ চোখে ড়ল গেট থেকে সেই বিধবা মহিলা বেরোচ্ছেন বিজন দত্তর ছেলের াত ধরে, তাঁর পিছনে বিজন দত্তর স্ত্রী ক্লান্ত পায়ে আসছে

তখন আমি জানলাম, ও এবার মারা যাবে

# গ্যালারির মুখগুলি

ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে দুজন ইতস্তত করল। উপুড় হয়ে, মাথাটা হাঁড়িকাঠের মত দুই বাহুর মধ্যে রেখে গীতা মেঝেয় শুয়ে, সন্ধ্যা থেকেই এইভাবে শুয়ে থাকে, কিছু করার না থাকলে। ওরা দুজন তাক থেকে পড়ার বই নিয়ে, ঘরের কোণে খাট আর দেয়ালের অল্প জায়গাটুকুতে বসল, খাটটা ইট দিয়ে উঁচু করা, সংসারের তিন-চতুর্থাংশ বস্তু রাখা, ঘরের বাইরে দালানটায় রান্না হয়। রাত্রে ক্যাম্প খাট পেতে অসীম শোয়।

বিড়বিড় করে ওরা পড়ছে। গীতা ওদের দিকে না তাকিয়েই বলল, "সারাদিনই তো শুধু খেলা, হাত-পায়ের নোংরা কাদা ধোবে কে?"

ওরা দুজন গুটিগুটি ঘর থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে, গীতা আবার বলল, "নন্দুকে বলো বাড়ি ফিরতে, দীপ্তিদের বাড়ি গেছে।"

নীলু আর বাচ্চু রাস্তার টিউবওয়েলে পরিষ্কার হয়ে, পেট ভরে জল খেল।

"হারুদাদের রকে ক্যারাম খেলছে, যাবি?"

"দেরি হয়ে যাবে, দিদিকে ডাকতে হবে না?"

নীলু এক বছরের বড়, স্বরে তা ফুটে উঠল।

দীপ্তিদের সদরে দাঁড়িয়ে নীলু চিৎকার করে ডাকতেই ছাদ থেকে ঝুঁকে নন্দু বলল, "একটু পরে যাচ্ছি বল গিয়ে।" নীলু ওর মুখটা দেখার চেষ্টা করল, অন্ধকারে দেখতে পেল না, ফেরার সময় হঠাৎ

বাচ্চু হেঁচকি তুলে, কুঁজো হয়ে বমি করল। শুধু টিউবওয়েলের জলটুকু বেরোল। কাতর হয়ে বারবার সে বলল, "মাকে বলবি না তো?"

ঘরে এসে ওরা এবার চেঁচিয়ে পড়তে শুরু করল। গীতা একই ভাবে শুয়ে। সাতদিন ধরে একই পদ্য চিৎকার করে পড়ে চলেছে বুঝেও সে চুপ রইল।

তখনই নন্দু ফিরল।

"ও বাড়িতে এতক্ষণ পর্যন্ত থাকার কি আছে? ডাকলে গ্রাহ্য হয় না, সঙ্গে সঙ্গে আসতে পার না?"

"আসছিলুম তো? বুড়িদির শ্বশুরবাড়ি থেকে কাঁঠাল পাঠিয়েছে; জেঠিমা বলল, অত বড় কাঁঠাল কে খাবে।"

পড়া বন্ধ করে নীলু বাচ্চু তাকাল। গীতা উদ্যত হাতটা নামিয়ে নিয়ে বলল, "খেয়ে এসেছিস?"

"গোটাটা খেলি?" নীলু বিশ্বাস করতে পারছে না।

বাচ্চু বলল, "দিদির পেট খারাপ হবে, না মা?"

গম্ভীর হয়ে নন্দু শাড়ি বদলাতে লাগল। পড়া ভুলে ওরা তাকিয়ে। গীতা ক্লান্তস্বরে বলল, "কাপড়গুলো সকাল থেকে সেদ্ধ হয়ে পড়ে আছে, কাচবি কখন?"

"চৌবাচ্চায় কি জল আছে?- ওপরের ওরা তো বিকেলে হুড় হুড় করে জল ঢেলে গা ধুল।"

"না থাকে, নীলু টিউকল থেকে এনে দেবে।"

সঙ্গে সঙ্গে নীলু দাঁড়িয়ে পড়ল। বাচ্চু বলল, "আমি কল টিপব।"

গীতা দুই বাহুর হাঁড়িকাঠে মাথা রেখে আবার শুয়ে রইল।

নিঃসাড়ে ঘরে ঢুকে নৃসিংহ জামা খুলছে টের পেয়েই গীতা উঠে বসল। তাকাচ্ছে না নৃসিংহ তার দিকে। চশমাটা ঘামে পিছলে

নেমে এসেছে অনেকখানি। লুঙ্গি পরে চশমাটা আঙুল দিয়ে ঠে
তুলে দিল।

"কাল রেশন আসবে কি?"

গামছা নিয়ে নৃসিংহ সাবানের বাক্সটা খুলে দেখার ছলে গীত
দিকে তাকিয়েই বেরিয়ে গেল দ্রুত। নন্দুর কাপড়কাচার ধপধপ শ
আসছে। গীতা বসে থাকল দেয়ালে ঠেস দিয়ে। নীলু চেঁচাবে
"দিদি! বালতি দে, বাবা টিউকলে চান করবে।"

চোখ বুঁজে গীতা বসে আছে। সদরে কড়া নেড়ে কে বল
"অসীম ফিরেছে?"

"না", নন্দু চেঁচিয়ে বলল।

"ফিরলে বলবেন পটাদা খোঁজ করছিল, যেন বাড়ি থাবে
আমি আবার আসব।"

গীতা ঘর থেকে বেরিয়ে এল। বছর চল্লিশের কালো, বেঁটে-খা
একটা লোক। হাতে ফোলিও ব্যাগ। পাঞ্জাবির বুকপকেটে ঝু
রয়েছে চশমার একটা ডাটি। গলায় প্রচুর চর্বি—তার মধ্যে বা
আছে পাতলা সোনার চেন।

"অসীমকে খুঁজছি।"

"আমি অসীমের মা।" সন্তর্পণে গীতা বলল। লোকটা তখ
দোকানদারের মত নমস্কার করে বলল, "আগে এক বার ঘুরে গে
বৌদি। আমাদের গ্রামে কাল ফাইনাল খেলা, আমার টীম উঠেছে
লোকটির মুখ সুখে ভরে উঠল। তারপরই অসহায় কণ্ঠে বল
"আমার স্টপার ছেলেটার মা আজ মারা গেছে।"

বলে তাকিয়েই রইল গীতার দিকে। অস্বস্তি বোধ করল গীতা
ভেবে পেল না কি বলা উচিত।

"অসীমই আমায় উদ্ধার করতে পারে।" লোকটা হাঁফ ছেড়ে উঠল।

"ও তো হাবড়া না কোথায় খেলতে গেছে, আসার তো কিছু ঠিক নেই।"

"তাইতো!" লোকটি মুষড়ে পড়ল। "হঠাৎ এমন বিপদেই পড়ে গেলুম, মৃত্যুর ওপর তো হাত নেই কারু। গেছলুম ফার্স্ট ডিভিসন প্লেয়ারের কাছে। একশো টাকা আগাম দোব বলে কবুল করলুম। বলল, আজ সকালেই আর এক জায়গা থেকে টাকা খেয়ে বসে আছে। না গেলে তারা পিঠের চামড়া তুলে নেবে।"

লোকটা জোরে কথা বলে। তড়বড়িয়ে বলে, বেশি বলে। গীতা অভ্যস্ত নয় এইসব কথাবার্তায়। চুপ করে রইল।

"আমি বরং একটু ঘুরে আসছি। দাদা কোথায়?"

"উনি চান করছেন।"

"আচ্ছা আচ্ছা, অসীমকে আমার হয়ে একটু বলবেন। বড্ড বিপদে পড়ে গেছি। মৃত্যুর ওপর তো আর হাত নেই।"

নৃসিংহ ফেরা মাত্র গীতা কথাগুলো তাকে জানাল।

"বসতে বললে না কেন? আজই তাহলে খোকা কিছু টাকা পেয়ে যেত। ঘুরে আসছি মানে ততক্ষণ আর কাউকে ধরতে গেল। পেয়ে গেলে আর আসবে না।"

হতাশায় নৃসিংহ খাটে গা এলিয়ে দিল। গীতা ব্যস্ত হয়ে নীলুকে বলল, "দেখ তো, লোকটা বেশি দূর হয়তো যায়নি। দেখলে ডেকে নিয়ে আসবি।"

নীলুর সঙ্গে সঙ্গে বাচ্চু ও ছুটে বেরিয়ে গেল। বিরক্তস্বরে নৃসিংহ বলল, "বুদ্ধি করে আটকে রাখবে তো।"

"কিভাবে আটকাবো ? দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গল্প করবো না ঘরে এ
বসাবো ? এক কাপ চাও তো দিতে হবে।"

রেগে উঠল গীতা। সদরে এসে উঁকি দিয়ে দেখল। উঠোনে
তারে ভিজে কাপড় মেলতে মেলতে নন্দু গুন গুন করছে। এক
পরেই নীলু বাচ্চু ফিরল মাথা নাড়তে নাড়তে।

"পঞ্চাশ টাকা হাতে না নিয়ে খোকার যাওয়া উচিত হবে না
ফার্স্ট ডিভিসন প্লেয়ারকে একশো দিলে ওর তো কমকরে পঞ্চা
পাওয়া উচিত।" গীতা ঘরে ঢোকা মাত্র নৃসিংহ বলল।

"অত কি দেবে, নবদ্বীপে তো তিরিশ পেয়েছিল।"

"কত বড় একটা মাছ এনেছিল।" বাচ্চু দ্রুত যোগ করল।

"বিপদে পড়ে এসেছে বলেছে যখন, পঞ্চাশ চাইলে তা
দেবে। ফার্স্ট ডিভিসনের যা সব প্লেয়ারের ছিরি, খোকা তাদের থে
কিসে কম।" নৃসিংহ উঠে বসল। "ওসব নামকাওয়াস্তেই ডিভিসনে
প্লেয়ার, এই বয়সে আমি যা থ্রু দোব পারুক দেখি কেউ।"

"গৌতমের সঙ্গে পারবে ?" বাচ্চু ফিসফিসিয়ে নীলুর কাছে
জানতে চাইল। আড়ে বাবাকে দেখে নিয়ে নীলু ঠোঁট ওল্টালো
"দাদার সঙ্গেই পারবে না।" বাচ্চু সায় দেবার মত চোখ করল।

"আমরা শিখেছিলুম মুখে রক্ত তুলে। তখন তো পঁচিশ-পঞ্চা
হাজারের ব্যাপার ছিল না যে টাকার মুখ চেয়ে খেলব। ট্রামভাড়
পেলেই বর্তে যেতুম। তবুও তো খেলেছি।"

নৃসিংহ চিবুক তুলে এমনভাবে তাকাল যে ছাব্বিশ বছরের চেন
স্বামীকে গীতার মনে হল এই প্রথম দেখছে। নন্দু গল্পের বই নিয়ে
বসেছে। গীতা বলল, "দেখ না নন্দু, একটু ভাল চা পাওয়া যায়
কিনা, ভদ্রলোক এলে দিতে হবে তো।"

"দীপ্তিদের বাড়ি থেকে ?" চোখ না তুলেই নন্দু বলল। "পারব না। কেরোসিন এনেছিলুম এখনো শোধ দেওয়া হয়নি। আমি আর কিছু চাইতে পারব না।"

"তা পারবে কেন, শুধু লোকের বাড়ি খেয়ে আসতে পারবে। সংসারে উপকার হয় যে কাজে তা করবে কেন ?"

"করি না ? ঝিয়ের মত শুধু তো খেটেই চলেছি। ভাল একটা কাপড়ও জোটে না। একটা সিনেমা পর্যন্ত দেখতে পাই না, শুধু গালাগাল আর মার ! এবার যেদিকে দুচোখ যায় চলে যাব।"

নন্দু গলা কাঁপিয়ে তারপর দপদপিয়ে বেরিয়ে গেল। বিকৃত করা ছাড়া নৃসিংহ মুখটাকে নিয়ে আর কিছু করতে পারল না। উঠে দাঁড়িয়ে বলল, "রকে গিয়ে বসছি।"

থম হয়ে বসে রইল গীতা। নীলু কিছু বলতে যাচ্ছিল, ধমকে উঠল, "তোদের কি পড়াশোনা নেই ?"

রকের একপ্রান্তে কয়েকজন যুবক তাস খেলছে। কর্পোরেশনের আলোটা দিনেও জ্বলে। বালবটা কয়েক হপ্তা অন্তর কেটে যায়। এবার কবে কাটবে তাই নিয়ে নৃসিংহ ও পরিমলবাবু কথা শুরু করে গাফিলতি, ঘুষ, ভেজাল ইত্যাদির বহুবিধ উদাহরণ দিয়ে মানুষ কি পরিমাণ চরিত্রভ্রষ্ট হয়েছে প্রমাণে ব্যস্ত হয়ে উঠল। নৃসিংহ বলল, "টাকা না দিলে আজকাল কোন কাজই করানো যায় না। খেলবে, তাও টাকার জন্য, আমাদের সময় ছিল ইজ্জত। ট্রফি নোব, ক্লাবের নাম বাড়াবো, তার জন্য প্রাণ পর্যন্ত দিতে পারতুম, আর আজকালকার ছেলেরা ?"

রকের প্রান্ত থেকে গলা খাঁকারি দিয়ে কে বলল, "রামায়ণ পাঠ শুরু হল।"

"মনে আছে, পরিমলবাবু, কে ও এস বি-র সঙ্গে সেমিফাইনাল ?"

"দু দিন ড্র হয়েছিল।"

"লিগামেন্ট ছিঁড়ে গেছে, হাঁটতে পর্যন্ত পারছি না।" নৃসিং উত্তেজনায় সিধে হয়ে গেল। গলা কাঁপছে।

পরিমলবাবু একটা বিড়ি এগিয়ে দিল। নৃসিংহ ভ্রূক্ষেপ করল না

"হারুবাবু এসে দুটো হাত চেপে ধরে বললেন, ক্লাবকে ফাইনালে তুলে দে। এত বড় সম্মান আগে ক্লাবের সামনে কখনো আসেনি হাত ছাড়া হয়ে যাবে, নৃসিংহ, তুই থাকতে ? কথাগুলো বুকে গেঁথে গেল। বুঝলেন, পরিমলবাবু, তখন মনের মধ্যে যা হল কি বলব অত বড় ক্লাব যেন আমার মুখ চেয়ে রয়েছে।"

"সেই খেলাই তো আপনার কাল হলো। পা-টা চিরকালের মত গেল। যাই বলুন, আপনার নামা উচিত হয়নি।"

হা হা করে নৃসিংহ হেসে উঠল।

"ফাইনালে ক্লাব উঠল। আমার থ্রু থেকেই নেট করল বিশু সামন্ত। এখনও দেখা হলে বিশু বলে—" নৃসিংহ লোকটিকে দেখে উঠে দাঁড়াল। "আপনি কি অসীমকে খুঁজছেন ?"

ঘাড় নেড়ে লোকটি কিছুক্ষণ ধীরে ধীরে বিস্ময় দ্বারা আবিষ্ট হবার পর বলল, "ইস ! একি চেহারা হয়েছে দাদা। চিনতেই যে পারা যায় না। সেই ছোটবেলায় কবে দেখেছি আর এই। ওই গোরা টীমগুলোর সঙ্গে আপনার সেইসব খেলা ! এখন তো মাঠেই যেতে ইচ্ছে করে না।"

চশমাটা উপরের দিকে ঠেলে দিয়ে নৃসিংহ বলল, "থাক্ থাক্ ওসব কথা ভাই, আর তুলে লাভ কি ? দিন তো কারু জন্য বসে থাকে না।"

ঝরঝর করে হেসে নৃসিংহ লোকটিকে নিয়ে যেতেই তাসের দলের একজন বলল, "পরিমলবাবু, গপ্পো করার যদি দরকার হয় অন্য কোথাও গিয়ে করুন। পাঁচ লক্ষবার ওর গপ্পো শুনেছি, আমাদের বাবারাও শুনেছে। আর পারা যায় না।"

"না না, তোমরা ঠিক জান না, সত্যি কথাই বলে লোকটা। আমরা যে দেখেছি ওর খেলা।" পরিমলবাবু দ্রুত স্থান ত্যাগ করলেন।

ঘোমটা দিয়ে গীতা খাটের ধারে দাঁড়াল। নৃসিংহ ওর দিকে তাকিয়ে লোকটিকে বলল, "যাবে কিনা তাতো বলতে পারবো না। বলছিল না গো কাল কোথায় যেন যেতে পারে?"

গীতা কিছু একটা বলল অস্ফুটে। লোকটি দু-জনের দিকে তাকিয়ে কাতর হয়ে পড়ল।

"গ্রামের টীম কিছুই খেলতে পারে না। একজন অন্তত ডিফেন্সটা যদি সামলে না রাখে তাহলে একেবারে ডুবে যাব। ওরা পাঁচ-জনকে হায়ার করে নিয়ে যাচ্ছে কলকাতা থেকে।"

"জানি না, ইতিমধ্যে খোকা অ্যাডভান্স নিয়ে ফেলেছে কিনা।" নৃসিংহ চিন্তান্বিত মুখে লোকটিকে বলল।

"তাহলে ফেরত দিয়ে দিক, আমি তিরিশ টাকা দিয়ে যাচ্ছি। বলে দিক পায়ে চোট লেগেছে। এর ওপর তো আর কথাই নেই।"

লোকটি সড়াৎ করে চেন টেনে ব্যাগ খুলল। তিনটে দশ টাকার নোট নৃসিংহের দিকে এগিয়ে ধরতেই গীতা চাপা গলায় বলল, "খোকার হাতে দিলেই ভাল হয়।"

"তাতে কি হয়েছে। বাবা মা কি পর?".

লোকটি যে দ্রুত টাকা ধরিয়ে দিতে চায়, নৃসিংহের হাতে গুঁজে দেওয়ার ব্যস্ততার মধ্যে গীতা টের পেল।

"তা ছাড়া কার হাতে দিচ্ছি সেটাও তো দেখতে হবে বৌদি। দাদাদের কাছে শুনেছি, গোল করে তারপর রেফারিকে জানিয়ে দিলেন হাতে ঠেলে গোল করেছি। সোজা ব্যাপার নয়, মহমেডানের সঙ্গে খেলা ছিল। হাফটাইমে সাপোর্টাররা সব গ্যালারি থেকে নেমে এল ওঁকে মারবার জন্য। জুতো ছুঁড়ছে, ঢিল মারছে। তখন উনি বললেন, ধৈর্য হারাচ্ছেন কেন?—হ্যাঁ দাদা, বলুন না কি বলেছিলেন?"

"থাক থাক ওসব কথা।" নৃসিংহের গলা ভারী হয়ে এল। চশমাটা ঘামে নেমে এসেছে। হাতে নিয়ে বাচ্চুর জামায় ডাঁটিটা মুছতে মুছতে বলল, "ঠকিয়ে জিতে দুটো পয়েন্ট পাওয়া যায় কিন্তু আনন্দ?"

"শুনলেন তো, বৌদি, শুনলেন, এই লোকের হাতে তিরিশ কেন তিন কোটি টাকাও আমি তুলে দিতে পারি। এর ওপর আর কোন কথা চলতে পারে না।"

লোকটি খুব হাসতে থাকল। নৃসিংহ দেখল গীতা একদৃষ্টে বিহ্বল হয়ে তার দিকে তাকিয়ে।

"আমি তো ঠিক জানি না খোকা কত টাকা নেয়, সেদিন তো কাকে যেন বলছিল ওর রেট এখন পঞ্চাশ।"

"দোব দোব। আমার কাছে আর টাকা নেই, বিশ্বাস করুন, পঞ্চাশই দোব।"

"চা হচ্ছে খেয়ে যাবেন।" দরজার বাইরে নন্দুকে হাতছানি দিয়ে ডাকতে দেখে গীতা বলল।

"না না, আমাকে এখুনি ট্রেন ধরতে হবে।" ঘড়ি দেখতে উঠে দাঁড়াল। "কাল সকালে ঠিক নটায় আসব। ওকে রেডি হয়ে

াকতে বলবেন।"

লোকটি চলে যাবার পর নোটগুলো গীতার হাতে দেবার ময় নৃসিংহ বুঝতে পারল, কিছু একটা হচ্ছে তার দেহে-মনে। হুদিন এমন হয়নি। আনন্দ সহকারে সে বলল, "ওদের খেতে দাও।"

নীলু বাচ্চুর খাওয়া দেখতে দেখতে নৃসিংহ বলল, "শুকনো রুটি খতে ওদের ভাল লাগছে না, একটু বোঁদে আনলে কেমন হয়?"

"না না, ওর থেকে এক পয়সাও নয়।" গীতার স্বরে তুজোড়া চাখের উত্তেজনা দপ করে নিভে গেল।

"নীলু কাল সকালেই রেশন দোকানে যাবে। না হলে বাবা াদা কেউ ভাত খেয়ে বেরোতে পারবে না।"

"মা জানো", গল্পের বই থেকে মুখ তুলে নন্দু বলল, "দীপ্তির কাকা াজ সাড়ে তিন টাকা কিলোর চাল কিনেছে।"

"ওদের কথা বাদ দে।"

রাত হয়ে গেছে। অসীম এখনো ফেরেনি। নৃসিংহ রাস্তায় ায়চারি করে ফিরে আসতেই গীতা বলল, "দূরে গেলে এই রকম দেরি তা হয়ই। কোনদিন কি লক্ষ্য করেছ? মুখ ফুটে একদিনও কি জজ্ঞেস করেছ, কেমন খেলছিস?"

"কেন কেন, বলেছে নাকি কিছু?"

"বলবে আবার কেন, দেখে বুঝতে পারি না? নয় বাপের মত ের অত নামই হয়নি।"

নৃসিংহ বলল, "ওর খাওয়ার দিকে একটু নজর দিতে হবে। ডিম ়ধের ব্যবস্থা করতে হবে।"

"যাক্ খুব দরদ দেখানো হচ্ছে, দেখো ও তোমার থেকেও ভালো খলবেখন।"

শুনে নৃসিংহের শরীর চুইয়ে সুখ নামতে শুরু করল। ধীরে ধীরে সে আনমনা হয়ে গেল।

অবশেষে অসীম ফিরল। ছেলেরা ঘুমিয়ে পড়েছে, নন্দুও। নৃসিংহ ওর চলন দেখে এগিয়ে এসে হাত ধরল।

"কোথায় লেগেছে?"

"আবার সেইখানটায়।" ডান ঊরুতে, হাতের ভর দিয়ে নিচু হয়ে অসীম খাটে বসল। প্যাণ্ট তুলে বাঁ পা ছড়িয়ে বড় করে বসল।

"চুন হলুদ গরম করো তো।" পায়ের গোছে হাত বুলিয়ে বলল, "দুটো খাস্তা উইং ব্যাক দু-পাশে। হুড়হুড় করে ইনসাইড দুটো ঢুকে আসছে, স্টপার কি করবে?"

"হেরে এসেছিস?"

"খেয়ে এসেছিস?"

"আর খাওয়া। টাকা পর্যন্ত দেয়নি। দুটো উল্লুক ব্যাক নিয়ে স্টপার কি করবে? মাইলখানেক প্রায় অন্ধকারে ছুটেছি।"

বুকে হাত বোলাচ্ছে অসীম। টেরিলিন শার্টের গলা দিয়ে বুকের লোম নৃসিংহের চোখে পড়তে তার মনে হলো, পুরো দস্তুর পুরুষ হয়ে উঠেছে ছেলেটা।

"এখনো মিষ্টির দোকান খোলা আছে, আনব?"

"বাড়িতে কিছু নেই?"

"আমি তো জানি খেয়েই আসবি!"

নৃসিংহর হাতে টাকা দেবার সময় গীতা লক্ষ্য করল, অসীম দেখছে। বুকটা ছ্যাঁত করে উঠল। ও জানে না এটা কিসের টাকা। এখন জানানো উচিত হবে কি। তাড়াতাড়ি সদরে গিয়ে নৃসিংহকে দাঁড় করালো।

"কাল তাহলে কি হবে ?"

"এখন কিছু বোল না।"

কাগজ জ্বেলে গীতা চুন হলুদ গরম করে লাগিয়ে দিল।

"জিতলে ব্যাটারা মুরগীর ঝোল খাওয়াবে বলেছিল।" মুখটাকে বেঁকিয়ে অসীম হাঁ করে চিত হয়ে পড়ল। ঝুঁকে গীতা বলল, "হ্যাঁরে, খুব বেশি লেগেছে কি ? একটা লোক এসেছিল, পটাদা নাম বলল। কাল তারকেশ্বরের কাছে ওদের খেলা।"

"রাখো তোমার খেলা। এই পা এখন কি ভোগায় কে জানে ?"

"পঞ্চাশ টাকা দেবে বলেছে", গীতা আর একটু ঝুঁকল। অসীমের মুখটা ফ্যাকাশে দেখাচ্ছে। চামড়া রুক্ষ, গাল চোপসান, কানের পাশের হাড় উঁচু, বুক চ্যাপ্টা, কনুইয়ে শিরার জট। গীতার মনে হল এই বয়সে একটা ছেলের যেমন দেখতে হওয়া উচিত খোকা তা নয়। যেমন করে কথা বলা উচিত তা বলে না। গীতা দুঃখে ভরে উঠল।

অসীম পায়চারি শুরু করল। লাগছে বেশ। উবু হয়ে বসার চেষ্টা করতে করতে দাঁড়িয়ে পড়ল নৃসিংহকে ঢুকতে দেখে।

"এর আগেও তো এমন কত লেগেছে, আবার লাফালাফিও করেছিস।" গীতা লঘুস্বরে বলল, "তোর মত সহ্যশক্তি আমি বাপু কারুর দেখিনি। আর ফোলাটোলাও তো দেখছি না।"

অসীমের মুখ থেকে এক পরত রুক্ষতা মুছে গিয়ে তরলতা ভেসে উঠল। জোর পায়ে কয়েকবার লাফালো, কাল্পনিক বলে শট করল, তারপর বলল, "ফোলা আছে তো, সাবধান না হলে জন্মের মতন খতম হয়ে যাব।"

নৃসিংহ পান খাচ্ছে, হাতে সিগারেটের নতুন প্যাকেট। খাটে বসে বলল, "মিলিটারি টীমগুলোর কাছে কি কম মার খেয়েছি।"

লুঙ্গিটা হাঁটু পর্যন্ত তুলে সে মারের দাগ খুঁজতে শুরু করল। তারপর অপ্রতিভ মুখে গীতাকে বলল, "দই ছাড়া কিছু পেলাম না।"

"খাটটা পেতে দাও তো, মা, শোব।" অসীম উঠে দাঁড়াল।

গীতা দালানে ক্যাম্প খাট পাতছে সেই সময় নৃসিংহ বলল, "তোকে নেবার জন্য একজন এসেছিল।"

"জানি জানি।"

নৃসিংহ ওকে সাহায্যের জন্য কাঁধ ধরতে হাত বাড়ায়।

"ঠিক আছে, এমন কিছু লাগেনি।"

হাতটাকে অগ্রাহ্য করে অসীম দালানে গিয়ে ক্যাম্প খাটে বসল। নৃসিংহ সিগারেট ধরিয়ে তারপর কয়েকটা টান দিল। শুনতে পাচ্ছে অসীমের দই খাওয়ার শব্দ। গলা চড়িয়ে সে বলল, "কি দাম হয়েছে জিনিসের, দই দশ টাকা। আমরা আট আনা সেরের রুই দেখেছি, টাকায় চার সের দুধ। খাবে কি, খেলবেই বা কোত্থেকে।"

কোন সাড়া না পেয়ে নৃসিংহ চুপ করে গেল। চাপাস্বরে অসীম বলল, "বাবাকে ভাজভাজ করতে বারণ করো তো মা।"

"বলুক না, তুই অমন কচ্ছিস কেন। মিথ্যে তো আর নয়।"

"যাগগে", নৃসিংহ আবার বলতে শুরু করল, "শক্তিবাবু আজ দুঃখু করছিল—মাইনের টাকায় দশদিনের বেশি চলে না, ছেলেটা এম এস-সি পড়া ছেড়ে চাকরি নিয়েছে। পই-পই করে বারণ করলুম, যেভাবেই হোক তোর পড়ার খরচ চালাবোই, ছাড়িসনি পড়া, ছেলে শুনল না। মুখের ওপর বলল, ভাইবোনেদের ভাত থেকে বঞ্চিত করে বিদ্বান হয়ে আমার কাজ নেই।"

নৃসিংহ অপেক্ষা করল, দালান থেকে কোন কৌতূহল আসে কিনা। তারপর সিগারেটে টান দিয়ে বলল, "বলতে বলতে শক্তিবাবুর

হাউ-হাউ করে কি কান্না। একটা কথাই বার বার বলল, বাপের মুখ চেয়ে ভবিষ্যৎকে বিসর্জন দিল আমার ছেলে।"

গভীর রাত্রে গীতা বলল, "ওসব গল্প খোকার সামনে কোর না। কষ্ট পায় শুনে। কাল যদি খেলতে না যায়, তাহলে কি হবে, টাকা তো নিয়ে রাখলে।"

"টাকা কি আমি নিজের জন্য নিয়েছি?"

"যদি ভাল না হয়? টাকা সকালেই ফেরত দিতে হবে তো?"

দুজন চুপ করে রইল। ভারী নিশ্বাস ফেলতে ফেলতে দুজন কাঠ হয়ে যেতে লাগল। দুজনকে ক্রমশ ভয় ধরল। দুজন ধীরে ধীরে ফোঁপড়া হতে শুরু করল।

"বলছিল, আবার লাগলে জন্মের মত খতম হয়ে যাবে।"

"জানি, আমারও তাই হয়েছিল।"

"কাল টাকা দিয়ে দাও। যা খরচ হয়েছে পরে দিয়ে দেব।"

"কাল সকালেই ও ঠিক হয়ে যাবে।"

"ওর ভবিষ্যতের কথা ভাবতে হবে। কাল টাকা ফেরত দিয়ে দাও। যা খরচ হয়েছে পরে দিয়ে দোব।"

"তুমি কি শুধু ওর মুখ চেয়েই কথা বলবে? কাল লোকটা এসে যখন আমায় অপমান করবে?"

"নয় সইলে।"

"তোমার গায়ে লাগবে না?"

উত্তরের আশায় সারারাত জেগে রইল নৃসিংহ।

পরদিন সকালে রাস্তায় ভিড় জমে গেল, লোকটি চিৎকার করছে—"ওসব চালাকি আমার জানা আছে। না যায় আপনার ছেলে,

ামার টাকা ফেরত দিন, পুরো তিরিশ টাকা।”

ভিড়ে যারা নবাগত তাদের কৌতূহল মেটাতে লোকটি বৃত্তান্ত ানার আগে ভূমিকা শুরু করল। “মশাই! নামকরা প্লেয়ার ছিল, ত ভক্তি-শ্রদ্ধা করতুম আর সেই মানুষের কি অধঃপতন দেখুন—”

ঘরে নৃসিংহ মাথা নামিয়ে বসে, বাইরে থেকে লোকটির গলা সে আসছে। ঘরে কেউ কারুর দিকে তাকাচ্ছে না। উপর তলার াকেরা সিঁড়ি দিয়ে ওঠানামার সময় প্রাণপণে এ ঘরের দিকে না াকিয়ে যাবার চেষ্টা করছে। বাচ্চু বাইরে উঁকি দেবার চেষ্টা বছিল, নন্দু কান ধরে বসিয়ে দেয়।

“টাকা নিয়েছিলে কেন? কে নিতে বলেছে?” ঠক ঠক করে সীম কাঁপছে।

আস্তে আস্তে মাথা তুলে নৃসিংহ তাকাল গীতার দিকে। ‘এটা য়ৌথ দায়িত্ব, তোমার অংশ নেওয়া উচিত, তুমি কিছু বলো’—এই কথাগুলোই সে যথাসম্ভব চোখে ফুটিয়ে তুলল। দেওয়ালে গীতা স্থিরদৃষ্টি নিবদ্ধ রেখেছে। সরালো না।

‘এ সংসার কি একা আমারই। নিষ্ঠুর আমাকে হতেই হবে, তামার ভাগ কি শুধু স্নেহের?’ এই অভিযোগ তার চাহনিতে ফুটে উঠল। গীতা শোনার চেষ্টা করল না।

“তুমি ফুটবল খেলেছ না ঘোড়ার ডিম খেলেছ। গালাগালি দিক, থুথু দিক, জুতো পেটা করুক। আমি যাব না, কিছুতেই যাব না।”

দুহাতে মুখ ঢেকে অসীম নুয়ে পড়ল। বাইরে থেকে চিৎকার করে লাকটি অসীমকে ডাকছে। ঘরে সকলেই শুনতে পেল তবু বাচ্চু বলল, “দাদাকে ডাকছে।” নন্দু ধমকাল ওকে। নীলু ফিসফিসিয়ে

বলল, "তোর সবতাতেই ওস্তাদি !"

উঠে দাঁড়াল নৃসিংহ। সব কথা চোখ ঝাপটা দিয়ে তার এসে পড়ল।

"কোথায় যাচ্ছ ?" গীতার কাঁপাস্বরে চমকে উঠল অন্যরা।

"বাবা! যেও না।" নন্দু হাত ধরল নৃসিংহর। "যে কটা পড়েছে আমি দিচ্ছি, আমার জমানো আছে।"

'না', মাত্র একটি শব্দ মহীরুহ-পতনের মত ঘরে ছড়িয়ে পড়ল

বাচ্চু অনিশ্চিতভাবে নীলুর কাছে জানতে চাইল, "লোকটি বাবাকে মারবে ?"

নৃসিংহকে দেখামাত্রই রাস্তাটা চুপ করে গেল। অলসভাবে দুধারে তাকাল। পরিচিতরা তাকে লজ্জা থেকে রেহাই দিতে ঔদা দেখাতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। বারান্দায় মেয়েরা এক পা পেছিয়ে গে শিশুরা এগিয়ে এল কৌতূহলে, পথিকেরা কিছু একটা ঘটবে বলে হতে লাগল।

"আপনার সঙ্গে কি শত্রুতা আছে যে জব্দে ফেললেন ? ব বলুন কি করেছি ?" লোকটি চিৎকারের বদলে আর্তনাদ করে উ "বিপদে পড়েই এসেছি, প্যাঁচ কষে যদি আরও টাকা আদায় ক চান, করুন।" পাগলের মত ব্যাগের চেন টানল সে, পাঁচ টা একটা নোট এগিয়ে ধরল।

"নিন, নিন, উদ্ধার করুন আমায়।" ঠোঁটের কোণে ফেনা জ লোকটির। চোখে বেপরোয়া চাউনি।

"আরও চাই ? লজ্জার কি, কত দিলে অসীনের পা ভাল যাবে ?" ব্যাগ থেকে একটা দশ টাকার নোট বার করল। নৃসিং হাতটা টেনে নিয়ে মুঠোর মধ্যে গুঁজে দিতে গেল। ভাঙ্গা ডা

• হাতটা ঝুলে পড়ল। নৃসিংহ নিজেকে টানতে টানতে রকে এনে
াল। কপাল থেকে ঘাম গড়িয়ে চশমার কিনারে পৌঁছে গেছে।
াসীনরা স্বাভাবিক হয়ে উঠল। মেয়েরা রেলিংএ ঝুঁকে।

"বিশ্বাস করছেন না? নিজেই তো দেখলেন ও খোঁড়াচ্ছে।
াপনার টাকা থেকে যেটুকু খরচ করে ফেলেছি, শোধ করে দোব,
ঠক দোব, এই কৃপাটুকু অন্তত করুন।"

নৃসিংহ দুই হাত জোড় করতেই কুড়ুলের মত দশ টাকার নোট
রা একটি হাত নেমে এল। অসহায়ভাবে সে চারপাশ, উপরে এবং
দের দরজায় দাঁড়ান গীতার দিকে তাকাল। ঘাম গড়িয়ে নামছে
াচের উপর। মুখগুলো ক্রমশ আবছা হয়ে এল। কাঁচ ভেদ করে
াকাবার চেষ্টায় কুঁচকে গেল মুখের চামড়া, হাতদুটো ঝুলে পড়ল।
াথা নেড়ে নেড়ে সে বলল, "আমি ধর্মপথে থাকতে চাই। জোচ্চুরি
লঙ্ক আর এই বয়সে আমার মাথায় তুলে দেবেন না।"

"কিন্তু এখন আমি ওর বদলে কাকে পাব? সময়ই-বা কোথা।
ইভাবে আমার টীমকে ডোবাবেন না। দয়া করুন। আপনি
ললেই হবে।"

আর একজন বলল, "ওকেই নিয়ে যান না। এমন থ্রু পাশ দেবে
গাল অবধারিত।"

কয়েকটি শিশু হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল, "গোল, গোল, গোল।"

নৃসিংহ আর কিছু শুনতে পাচ্ছে না। বহু দূরের অস্পষ্ট ঢেউয়ের
ত হাজার হাজার চিৎকার মাথার মধ্যে উঠছে আর পড়ছে। মুখের
াছে মুখ এনে লোকটি কি সব বলছে। ঝাপসা কাঁচের মধ্য দিয়ে
ুনো বাসি লাগছে মুখটা গ্যালারি থেকে ধাপে ধাপে যেন নেমে
সে। নৃসিংহ বুঝতে পাচ্ছে না মুখটা কি চায়। থুথু দেবে, জুতো

ছুঁড়বে, ফালাফালা করে চিরবে ?

অনেক খেলাই তো দেখিয়েছেন যৌবনে. বুড়ো বয়সে খেল ত
নাই বা দেখালেন ?

কেন দেখাব না ? নৃসিংহ কথা বলার চেষ্টা করল। গলা বু
গেছে। চেষ্টা করেও গীতার কাপড়ের রঙ ঠাওর করতে পারল ন
লোকটা কি বলছে আর শোনা যাচ্ছে না। শুধু আবছা
গ্যালারিতে। আমার থেকেও খোকার ভবিষ্যৎ বড়। ওকে পা
না। থাকো সবাই দাঁড়িয়ে। দেখবে খোকা এসে জড়িয়ে ধরবে

কে একজন বলল, "ওকে বলে কিছু হবে না, মশাই, দেখছেন
স্যায়নার মত কেমন বিড়বিড় করছে। ওর বৌকে বলুন না,
তো দাঁড়িয়ে।"

কতক্ষণ কেটে গেছে নৃসিংহ তা জানে না। বোধহীন জড়পদা
মত রকে বসেছিল। হঠাৎ তার সাড় ফিরে এল।

"কে খোকা ?" ধড়মড়িয়ে নৃসিংহ উঠে দাঁড়াল। মনে হল
যেন বাবা বাবা বলে ডাকছে। রাস্তায় পথিকের আনাগো
শিশুরা খেলা করছে আর বাচ্চু অবাক হয়ে তাকিয়ে।

"দাদাতো খেলতে চলে গেছে। ভাত খেয়ে অফিস যাবে ন
মা ডাকছে।"

# পরগাছা

শীতে কলকাতায় ক্রিকেট শুরুর সঙ্গে সঙ্গে অনাদিও সাদা ট্রাউজার্স, সাদা শার্ট আর সাদা কেডস পরে হাতে কিট ব্যাগ ঝুলিয়ে ময়দানে এমাঠ ওমাঠ ঘুরে বেড়ায় আর সুযোগ পেলেই চুরি করে। ওর চাল-চলন বা কথায় কেউ সন্দেহ করে না। সহজভাবে খেলোয়াড় বা কর্মকর্তাদের সঙ্গে মেশে, টেণ্টের মধ্যে ঢুকে যায়। যখন মাঠে খেলা চলে এবং দু-দলের লোকেরা মাঠের ধারে খাটানো সামিয়ানার নিচে অথবা টেণ্টের মধ্যে যখন ঢিলেঢালা পাহারা, অনাদি তখন কাজ হাসিল করে। হাতঘড়ি, ফাউণ্টেন পেন, মানি-ব্যাগ, শার্ট বা ট্রাউজার্স, দামী ব্যাট, জুতো যা পায় হাতিয়ে নিয়ে সরে পড়ে।

সেদিন অনাদি ব্যাগ হাতে একটু ব্যস্ততার সঙ্গে মালিকে জিগ্যেস করল, "এটা কোন ক্লাবের মাঠ?"

"ইউনাইটেড ক্লাবের।"

"এ মাঠে আজ হাতিবাগান স্পোরটিংসের খেলা না?"

মালি ঘাবড়ে গেল, তারপর বিরক্ত হয়ে বলল, "কি জানি, বাবুদের জিজ্ঞাসা করুন।" চুনগোলা বালতি নিয়ে মালি মাঠের দিকে চলে গেল। অনাদি লক্ষ্য করল টেণ্টের দরজায় দাঁড়িয়ে ধুতির মধ্যে শার্ট গোঁজা, টাকমাথা এক মাঝবয়সী লোক খুবই উৎকণ্ঠিত হয়ে এধার ওধার তাকাচ্ছে। টেণ্টের মধ্যে বুট পরে সিমেণ্টের মেঝের

উপর চলাফেরার শব্দ হচ্ছে খড়মড় খড়মড়। ড্রেস-করা একজন ভিতর থেকে বেরিয়ে এসে টাকমাথাকে কি যেন বলতেই লোকটি রেগে উঠে চেঁচিয়ে বলল, "আসবে কি আসবে না, সেটা ঠিক করে বললেই তো পারত। এখুনি তো টীমের নাম সাবমিট করতে হবে।"

টেন্ট এবং তার সংলগ্ন কাঠাছুয়েক জমি নিচু ফেন্সিং-এ ঘেরা। তার মধ্যে রয়েছে ঘাসে-ঢাকা একফালি জমি। কিছু গাঁদাফুলের গাছ। তুটো বেঞ্চ। টিউবওয়েল। অনাদি এগিয়ে গেল টাকমাথা লোকটির দিকে।

"আচ্ছা, আজ কি এখানে হাতিবাগানের খেলা আছে?"

"হাতিবাগান!" লোকটি অবাক হয়ে গেল। "ও নামের কোন ক্লাব খেলে নাকি?"

"তাতো জানি না।" আমতা আমতা করে অনাদি বলল, "আমার এক বন্ধু বলেছিল কিন্তু খেলাটা যে কোন মাঠে সেটাই ভুলে গেছি। লীগের নয়, এমনি ফ্রেণ্ডলি খেলা।"

"তাহলে এত বড় গড়ের মাঠে আর কি করে বার করবেন।" লোকটিকে অনাদির থেকেও বেশি হতাশ মনে হল। "আপনি খুঁজছেন ক্লাব, খেলবেন বলে, আর আমার ক্লাব খুঁজছে তার প্লেয়ারদের! কাল তিনজন একসঙ্গে বরযাত্রী গেছে রানাঘাটে, বলে গেছে ঠিক সময় মাঠে পৌছব। আর এখন দশটা বাজতে…"

টেন্টের মধ্যে থেকে শাদা-কোট্-পরা আম্পায়ারকে বেরিয়ে আসতে দেখে টাকমাথা চুপ করে গেল। "আর তু-মিনিট স্যার। আমি আপনার হাতে লিস্ট দিয়ে আসব। জাস্ট তু-মিনিট। বুঝতেই তো পারছেন এক মুশকিলে পড়েছি।"

আম্পায়ার হাতঘড়ি দেখে আবার ভিতরে ঢুকে গেল। লোকটি

কিছুটা আপন মনে কিছুটা অনাদিকে উদ্দেশ করে কাতরস্বরে বলল, "সাত সকালে মাংস রান্না করে, হাড়ি-কুড়ি, কাপ-ডিস-প্লেট, খেলার ব্যাট-প্যাড—এত লটবহর নিয়ে যদি ইছাপুর থেকে আসতে পারি, আর বাবুরা নেমন্তন্ন খেয়ে···ঘণ্টু ছাড়া তো মোটে ন'জন হাজির হয়েছে। ঘণ্টু স্কোর লিখবে, আরে ধোৎ·· এভাবে কি ক্লাব চালানো যায়!"

টেণ্ট থেকে চারটি ছেলে ব্যাট আর বল নিয়ে বেরিয়ে গাঁদা-গাছের পাশে খুটখাট শুরু করল। মাঠের ধারে খাটানো সামিয়ানার পাশে কয়েকজন বল লোফালুফি করছে। পাশের মাঠের সাইট স্ক্রীন বাতাসে খুলে বাঁশে ঝুলছে। পাশের টেণ্ট থেকে ভারী গলায় মালিকে ধমক দেবার শব্দ এল। অনাদির শীত করছে। রোদ্দুরে মাঠের ধারে ঘাসের উপর এখন উপুড় হয়ে শুয়ে থাকতে আরাম।

"বকুদা, তাহলে কি হবে?" কাগজ আর কলম হাতে, বুটের মড়মড় আওয়াজ তুলে একজন এসে দাঁড়াল। "ইউনাইটেড তো অনেকক্ষণ টীম সাবমিট করে দিয়েছে।"

অনাদি এগিয়ে গেছে খানিকটা। টাকমাথা লোকটি অর্থাৎ বকুদা ছুটে এসে ওর হাত ধরল। "কোথায় আর হাতিবাগান স্পোরটিংকে খুঁজে বেড়াবেন, তার চেয়ে আজ আমাদের হয়েই খেলে যান। নামটা কি বলুন তো, লীগে আর কোন ক্লাবের হয়ে খেলেননি তো? আর খেললেই বা কেউ ধরতে পারবে না। বরং একটা ফলস্ নামেই খেলুন, কেমন?"

অনাদিকে কথা বলার কোন সুযোগ না দিয়ে বকুদা ঘষঘষ করে কাগজে নাই লিখেই, "অঞ্জন বিশ্বাস, কেমন? তবু তো দশজন হল।" বলতে বলতে ছুটে টেণ্টের মধ্যে ঢুকল।

ইউনাইটেড ১৫৭ রান তুলল চার উইকেটে। অনাদি প্রথম আধ ঘণ্টার মধ্যেই তিনটি ক্যাচ ফেলল। প্রথমটি স্লিপে, দ্বিতীয়টি মিড-অনে, তৃতীয়টি ডীপ-স্কোয়্যার লেগে। পাড়ায় রাস্তায় ক্যাম্বিস বলে ক্রিকেট খেলার বেশি অনাদি আর খেলেনি। এ রকম একটা পরিস্থিতিতে পড়তে হবে কখনো ভাবেনি সে। তার দলের প্রত্যেকের মুখের বিস্ময়, অসহায় বিরক্তিতে রূপান্তরিত হল। মাঠের বাইরে দুটো চ্যাংড়া ছেলে কিছুক্ষণ ওর পিছনে লেগে অবশেষে একঘেঁয়ে বোধ করে চলে গেল।

অনাদিকে কোথায় যে দাঁড় করাবে, ভেবে পাচ্ছে না অধিনায়ক। লং লেগ থেকে লং অন তারপর ডীপ একস্ট্রা কভার, অবশেষে ডীপ থার্ড-ম্যান। উবু হয়ে ভয়ে ভয়ে দু-হাতে থাবড়ে বল আটকাতে গিয়ে আটটা বাউণ্ডারী দিল অনাদি। ওর কাছে বল গেলেই ব্যাটসম্যানরা নির্ভাবনায় রান নেয়। মাঠের বাইরে ইউনাইটেডের লোকেরা তখন হইচই হাসাহাসি করে। মাঠের মধ্যে একজন, ওভার শেষে অনাদিকে শুনিয়েই বলল, "বকুদা আর লোক পেল না, একটা পাঁঠাও যে এর থেকে ভাল ফিল্ডিং দেবে।" শুনে হাসি লুকোবার চেষ্টাও করল না বোলারের দিকের আম্পায়ার। একজন ব্যাটসম্যান খুবই সহানুভূতির সঙ্গে উইকেটকীপারকে বলল, "এখন আর কিছু বলবেন না দাদা, তাহলে আরো ঘাবড়ে যাবে।"

এরপর অনাদি ক্ষ্যাপার মত ছোটাছুটি শুরু করল। বুক দিয়ে, হাঁটু দিয়ে, এমনকি ঝাঁপিয়ে মাথা দিয়েও বল আটকাল এবং সবাইকে তাজ্জব বানিয়ে রান আউটও করল প্রায় ত্রিশ গজ দৌড়ে এসে, কভার থেকে সোজা উইকেটে বল মেরে। তিন-চারজন ফিল্ডার ছুটে এসে ওর পিঠ চাপড়াল, আউট-হওয়া ব্যাটসম্যানটিও হেসে

'গুড থ্রো' বলে গেল। অনাদি অভিভূত হয়ে বোকার মত হাসল মাত্র এবং পরের ওভারেই অতি সহজ ক্যাচটি ফেলে দিল। মাঠের নয়জনের কণ্ঠ থেকে চাপা একটা আর্তনাদ উঠেই সেটা ক্রুদ্ধ গর্জনে পরিণত হল। ওভার শেষে অধিনায়ক অনাদির কাছে এসে উঁচু গলায় বলল, "দেখি তো, আপনার আঙুলে বোধহয় লেগেছে।" ওর হাতটা তুলে আঙুল পরীক্ষা করতে করতে তারপর দাঁতে দাঁত চেপে বলল, "আমরা ন-জনেই খেলব, আপনি দয়া করে বেরিয়ে যান।"

মাথা নামিয়ে মুখটা কালো করে অনাদি মাঠ থেকে বেরিয়ে এল, সবাই ওর দিকে তাকিয়ে। মুখ টিপে কেউ কেউ হাসল, বকুদা শুকনো-স্বরে বলল, "চলে এলেন কেন ?"

অনাদি বলল, "আঙুলে লেগেছে, খুব যন্ত্রণা হচ্ছে।"

বকুদা মুখ ফিরিয়ে মাঠের দিকে তাকাল। অনাদি ধীরে ধীরে সেখান থেকে সরে গেল। গেটের বাইরে রান আউট হওয়া ব্যাটসম্যানটি এক সুরূপা তরুণীর সঙ্গে হাসাহাসি করছে। একটি বছরদশেকের ছেলে ওর ব্যাটটি নিয়ে ছায়া-ড্রাইভ করায় ব্যস্ত। অনাদি আর টেন্টের দিকে গেল না।

লাঞ্চের পর ইছাপুর ব্যাট করতে নামল। চটপট ১৯ রানে তিনটে উইকেট পড়ে যাবার পরই জেতবার আশা ছেড়ে, ড্র-এর জন্য খেলতে লাগল। চতুর্থ উইকেটের দুই ব্যাটসম্যান সওয়া ঘণ্টা কাটিয়ে ৪৩ রান তুলেছে। অনাদির নাম সবার শেষে দশ নম্বরে। ইতিমধ্যে ও ঠিক করে ফেলেছে, চলে যাবে ব্যাট না করেই। লাঞ্চের সময় দেখে রেখেছে একটা সোয়েটার, যার দাম অন্তত আশি-নব্বই টাকা। প্রাকৃতিক কাজের ছুতোয় টেন্টের মধ্যে বারদুয়েক ঘুরে এসে গাঁদা-গাছের ধারে বেঞ্চে বসে অপেক্ষা করতে করতে অনাদি ভিতরে নজর

রাখল। মাঠে তখন লড়াই জমতে শুরু করেছে। কাজ হাসিল করে এইবার পালাতে হবে।

তখন সেই তরুণীটিকে টানতে টানতে বাচ্চা ছেলেটি ব্যাট হাতে হাজির হল। অনাদি অস্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেও কৌতূহলে তাকিয়ে রইল। ওকে দেখে তরুণীটি ঈষৎ বিব্রত হয়ে ছেলেটিকে বলল, "বুল, অসভ্যতা কোরো না। হাত ছাড়ো, বলেছি তো খেলব।"

"আগে তুমি ব্যাট করো।"

তরুণী তার হাতের ব্যাগটি কোথায় রাখবে ভেবে চারিদিকে তাকিয়ে ইতস্তত করছে; ছেলেটি ছোঁ মেরে তার হাত থেকে নিয়ে ছুটে অনাদির কাছে, বলল, "দিদির ব্যাগটা রাখুন তো।"

"আমি যে এখুনি যাব ব্যাট করতে।" অনাদি ঝুটঝামেলা এড়াবার জন্য বলল। ছেলেটি ওর কথায় কর্ণপাত করল না। ঘাড় ফিরিয়ে অনাদি খুবই বিরক্তচোখে ওদের এলেবেলে খেলা দেখতে লাগল। ছেলেটির প্রত্যেকটি বলই ফস্কে যাচ্ছে, তরুণী কুড়িয়ে আনছে, এবং মুখ লাল করে আবার ব্যাট হাতে দাঁড়াচ্ছে। দেখতে দেখতে অনাদি অন্যমনস্কের মত ব্যাগটির ঢাকনার স্প্রিং-এ চাপ দিতেই মুখটা ফাঁক হয়ে গেল। চমকে সে ঢাকনাটা বন্ধ করে এধার-ওধার তাকাল। কেউ দেখছে না তাকে, তবু দুরদুর করে উঠল ওর বুকের মধ্যে। অবশ-হাতে ব্যাগটা কোলের উপর রেখে অনাদি ওদের খেলার দিকে তাকিয়ে রইল।

কিছুক্ষণ পরই তার আঙুলগুলো কেঁপে উঠল। ঢাকনার স্প্রিং টিপল সন্তর্পণে। রুমাল, চিরুনী ইত্যাদির মধ্য দিয়ে তার আঙুল দ্রুত ব্যাগের তলদেশে পৌঁছল। বৃত্তাকার, কঠিন একটি জিনিসের স্পর্শ পেতেই তার মনে হল নিশ্চয় আংটি! দুই আঙুলে সেটিকে

চিমটের মত ধরে, তরুণী ও ছেলেটির খেলার দিকে স্থির-চোখে তাকিয়ে থেকে, টেনে বার করে এনেই ট্রাউজার্সের পকেটে রেখে ব্যাগটি বন্ধ করল। তারপর সতর্ক-দৃষ্টিতে চারধারে তাকিয়ে আশ্বস্ত বোধ করতে করতে উত্তেজনায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়ল। খেলার মাঠ থেকে সোর-গোলের যে শব্দটা অনাদি এতক্ষণ শুনতে পাচ্ছিল না, ক্রমশ সেটা স্পষ্ট হয়ে উঠতে লাগল।

"একি, আপনি এখানে!" হন্তদন্ত হয়ে বকুদা হাজির হল। "ছটা উইকেট পড়ে গেছে, জানেন না? এখনো প্যাড পরেননি!"

"হ্যাঁ, এই যাই"—অনাদি ধড়মড়িয়ে উঠে দাঁড়াল। "খোকা! ব্যাগটা রইল।"

সামিয়ানার তলায় প্যাড পরতে পরতে অনাদি খুব ঝরঝরে বোধ করল। বকুদা ওর পাশে বিড়বিড় করে যাচ্ছে—"আর কুড়ি মিনিট বাকি। কাটিয়ে দাও, মদনমোহন! বুঝলেন, রানের কোনো দরকার নেই। কোনো রিস্ক নেবেন না। স্টাম্পের বাইরের বলে একদম ব্যাট ঠেকাবেন না। হে মদনমোহন! আর আঠারো মিনিট। অনেক-ক্ষণ টাইম নেবেন ফিল্ড দেখার জন্য, মাঝে মাঝে প্যাডের বকলেশ ঠিক করবেন, বদলাবার জন্য ব্যাট চাইবেন। আর—" মাঠের মধ্যে হঠাৎ বীভৎস চিৎকার ওঠায় বকুদার কথা থেমে গেল। ইছাপুরের সপ্তম উইকেটটি পড়ল লোপ্পাই ক্যাচ দিয়ে। নবম ব্যাটসম্যান নামতে চলেছে, বকুদা ভগ্নস্বরে বলল, "আর পনেরোটা মিনিট আছে রে।"

অনাদি দেখছিল, আড়ষ্ট-পায়ে, ভীতচোখে এধার-ওধার তাকাতে তাকাতে কেমন করে ব্যাটসম্যানটি উইকেটের দিকে চলেছে। ওর

হাসি পেল। ভাবল, আমার তো আসল কাজ হয়েই গেছে। ছুটকেটে যাব আর চলে আসব। হার-জিত নিয়ে আমার কোনো মাথাব্যথা নেই। আসলে ব্যাট করবে তো অঞ্জন বিশ্বাস। স্কোর-বুকে ওই নামই তো লেখা আছে।

"আমার স্পষ্ট মনে আছে, ব্যাগের মধ্যেই রেখেছিলাম।"

অনাদি চমকে উঠল পিছন-থেকে-বলা সেই তরুণীর কণ্ঠস্বরে।

"তাহলে যাবে কোথায়!" ভারী একটি পুরুষ-কণ্ঠ উদ্বেগ ও বিরক্তি-সহকারে বলল, "আর একবার ভাল করে ব্যাগটা দেখ।"

"তিন-চারবার তো দেখলাম।"

"ব্যাগটা কোথায় রেখেছিলে?"

অনাদি পাথরমূর্তির মত বসে। ওর মনে হল, একজোড়া চোখ তার দিকে তাকাচ্ছে। ঘাড় ফিরিয়ে পিছনে তাকালেই চোখাচোখি হবে। চোখদুটো নিশ্চয় তাকে সন্দেহ করছে। এইবার হয়তো বলবে, উঠে আসুন তো, আপনাকে আমরা সার্চ করবো। আপনি ছাড়া আর কে নিতে পারে? তারপর ওরা শেষ ব্যাটসম্যানকে যেভাবে ফিল্ডাররা ঘিরে ধরে সেইভাবেই গোল হয়ে ঘিরে ধরবে। তারপর ওদের একজন এগিয়ে আসবে।

পালাতে হবে। এই মুহূর্তে এখান থেকে পালাতে হবে। অনাদির মাথার মধ্যে শুধু এই কথাটিই পাগলা ঘন্টির মত বেজে চলল। কিন্তু কোন্ দিক দিয়ে কিভাবে পালাবে! এতদিন একবারও সে ধরা পড়েনি।

মাঠে আবার একটা হিংস্র উল্লাস ফেটে পড়ল। বকুদা অস্ফুট একটা আর্তনাদ করে বলে উঠল, "আর বারোটা মিনিট মাত্র।"

অনাদি ছিটকে উঠে দাঁড়াল। ব্যাটটা হাতে তুলে নিয়ে শুধু সামনের দিকে তাকিয়ে, মাঠের মাঝখানে যাবার জন্য সে প্রায় ছুটতে শুরু করল।

ওভারের চারটি বল বাকি ছিল। বুক এবং পেট দিয়ে দুটি বল সে আটকাল এল. বি. ডবল্‌.-র ফাঁড়া কাটিয়ে। তৃতীয় বল ওর ব্যাট ছুঁয়ে দু-জন শ্লিপ ফিল্ডারের মধ্যে দিয়ে গলে যেতেই অপর ব্যাটস-ম্যানের নিষেধ অগ্রাহ্য করেই এক রান নিতে ছুটল এবং অল্পের জন্য রান আউট হওয়া থেকে বাঁচল।

এরপরই অবিশ্বাস্য এবং হাস্যকর ব্যাপার ঘেটে গেল। অনাদি তেত্রিশ রান করল এই ওভারে। পাঁচটি ওভারবাউণ্ডারি ও একটি তিন। পরের ওভারে ত্রিশ রান। পাঁচটি ওভারবাউণ্ডারি। শেষ বলটি ব্যাটে লাগেনি এবং উইকেটকীপারও ফস্কায়, তাইতে ওরা একটি বাই রান নেয়। খেলার শেষ ওভারে অনাদি আরো দুটি ওভারবাউণ্ডারি মারার পরই দেখল মাঠের বাইরে থেকে ইছাপুরের খেলোয়াড়রা তার দিকে ছুটে আসছে পাগলের মত চিৎকার করতে করতে।

ওরা কাঁধে করে অনাদিকে টেণ্টে আনল। ঘটনার আকস্মিকতায় বিমূঢ় বকুদার চোখ দিয়ে শুধু জল ঝরে পড়ছে। ইউনাইটেডের খেলোয়াড়রা অবাক চোখে বার বার এখনো তার দিকে তাকাচ্ছে, আর খেলার প্রসঙ্গ বাদ দিয়ে নিজেদের মধ্যে আবোল-তাবোল কথা বলে যাচ্ছে। ওরা এখনো বিশ্বাস করতে পারছে না ব্যাপারটা। কে একজন বলল, "ব্র্যাডম্যানের চব্বিশ বলে সেঞ্চুরী করার রেকর্ডটা নিশ্চয়ই ভাঙতে পারতেন, যদি না উইন হয়ে যেত।" আর একজন বলল, "এ খেলার গল্প কাউকে করলে বলবে গাঁজায় দম দিয়ে বলছি।

ফ্যান্টাস্টিক! আজ কার মুখ দেখে যে উঠেছিলাম, সতেরো বলে ছিয়াত্তর রান!"

অনাদি চুপ করে বসে আছে। বিরাট এক বিস্ময়ের কেন্দ্রমধ্যে অবস্থান করার অনুভব সে বোধ করছে। এক বিচিত্র ঘূর্ণিতে পাক খাওয়ার আনন্দে তার ভিতরটা টলছে। হঠাৎ তার চোখে পড়ল, টেন্টের বাইরে বেঞ্চে তরুণীটি বিষণ্ণমুখে বসে, পাশে বাচ্চা ছেলেটি। তার আনন্দের রেশটা ওই বিষণ্ণ মুখ ছিঁড়ে দিল যেন। মুখ ফিরিয়ে অন্যত্র দৃষ্টিনিবদ্ধ করেও সে রেহাই পেল না। একটা পাষাণভার ক্রমশই তার বুকে চেপে বসছে।

অবশেষে অনাদি তরুণীর কাছে দাঁড়াল। পকেট থেকে আংটিটা বার করে এগিয়ে ধরে বলল, "এটা কি আপনার?"

"হ্যাঁ, এই তো!" বিষণ্ণতা মুহূর্তে খুশিতে ফেটে পড়ল। "পেলেন কি করে? বাবা! বাবা! পেয়েছি।" চিৎকার করে উঠল তরুণীটি।

"এই বেঞ্চের তলাতেই পড়েছিল। তখুনি বলব ভেবেছিলুম, কিন্তু এমন তাড়াহুড়োর মধ্যে ব্যাট করতে যেতে হল যে—"

"ওহ্, কি দারুণ যে ব্যাট করেছেন, ভাবাই যায় না···অকল্পনীয়, সত্যি বলছি আংটির কথাটা তখন একদম ভুলেই গেছলাম।"

বাচ্চা ছেলেটি বলল, "কাল কাগজে আপনার নাম বেরোবে, না?"

অনাদি মাথা নামিয়ে মৃদু মৃদু হাসল, তারপর ফিরে এল। বকুদা চায়ের কাপ এগিয়ে ধরে বলল, "সামনের রোববার শোভাবাজারের সঙ্গে খেলা, আসছেন তো?"

অনাদি উত্তর দেবার আগেই একজন ডাকল, "বকুদা, একটুখানি আসুন তো, কাগজের জন্য খবরটা কিভাবে লিখব বলে দিয়ে যান।"

ব্যস্ত হয়ে বকুদা স্থান ত্যাগ করতেই অনাদি আপনমনে হাসল। ভেবেছিল সকলের হাতে ধোলাই খাবে, কিন্তু বদলে পাচ্ছে তারিফ আর আপ্যায়ন। এখন নিকেকে অদ্ভুত রকমের ভাল লাগছে তার। আংটিটা ফেরত না দিলে, বিক্রি করে কয়েকটা টাকা পাওয়া যেত বটে, কিন্তু এই অনুভবের মধ্যে মহৎ না হয়ে উপায় কি!

নিজের ব্যাগটা হাতে নিয়ে যাবার জন্য উঠে দাঁড়াল। তখন তার কানে এল বকুদার কথাগুলো—"ভালভাবে রিকোয়েস্ট করে বোলো, যাতে অঞ্জন বিশ্বাস নামটা বোল্ড টাইপে ছাপায়।"

শুনে অবাক হয়ে গেল অনাদি। কে অঞ্জন বিশ্বাস? তারপরই মনে পড়ল, আর সঙ্গে সঙ্গে নিজের সম্পর্কে বিস্ময়জনিত যাবতীয় অনুভব থেকে বঞ্চিত হয়ে সে বোকার মত হাসল এবং নিজেকে শুনিয়ে বলল, "যাচ্চলে, আমায় লোকসান করিয়ে মাঝ থেকে সব ক্রেডিট নিয়ে বেরিয়ে গেল ব্যাটা!"

এরপর অনাদি কাউকে কিছু না বলে টেন্ট থেকে হনহনিয়ে বেরিয়ে গেল।